ছন্দপরিক্রমা

প্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দ পরিক্রমা

ছন্দপরিক্রমা

প্রবোধচন্দ্র সেন

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭২ বৈশাখ ২৫

১৯৬৫ মে ৮

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জিজ্ঞাসা ॥ ১এ কলেজ রো। কলিকাতা-৯

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

জেম ণ সহই কণঅ-তুলা
তিল-তুলিঅং অদ্ধ-অদ্ধেণ।
তেম ণ সহই সবণ-তুলা
অবছন্দং ছন্দভঙ্গেণ ॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১০

সয় না সোনার নিক্তি যেমন
ওজন-ফারাক আধ রতির,
তেমনি সূক্ষ্ম কানের নিরিখ
একটু খুঁতেই হয় অথির।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'ছন্দসরস্বতী'

ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।…যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ, ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ

Study carefully the phonetic system of a language, above all its dynamic features, and you can tell what kind of a verse it has developed—or, if history has played pranks with its psychology, what kind of verse it should have developed and some day will.

—Edward Sapir, *Language*

উ ৎ স র্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান্ ভবতোষ দত্ত

স্নেহভাজনেষু

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

*ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১৩৫২ আষাঢ়
*ধর্মবিজয়ী অশোক। ১৩৫৪ বৈশাখ
ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত। ১৩৫৬ বৈশাখ
India's National Anthem। ১৯৪৯ মে
ধম্মপদ-পরিচয়। ১৩৬০ শ্রাবণ
বাংলার ইতিহাস-সাধনা। ১৩৬০ ভাদ্র
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা। ১৩৬৮ বৈশাখ
রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি। ১৩৬৯ বৈশাখ
ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৯ কার্তিক

সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত 'ছন্দ'। ১৩৬৯ কার্তিক
*প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-অনূদিত 'মেঘদূত'। ১৩৩৭ ফাল্গুন : ১৩৪৬ বৈশাখ

প্রকাশিতব্য

ছন্দজিজ্ঞাসা। যন্ত্রস্থ
রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা
রবীন্দ্রচিন্তায় বাংলাদেশ

* নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য

নিবেদন

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দীর্ঘকালের চিন্তা, চর্চা ও অভিজ্ঞতার ফল। আশা করি এখানে তার একটু ইতিহাস দেওয়া অনুচিত হবে না।

ছন্দচর্চার ইতিহাস

ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়বার সময়েই বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়; আর তখনই তার বিশ্লেষণপ্রণালীর ত্রুটি এবং অপূর্ণতা আমার মনকে পীড়িত করে।

আমাদের বাংলাসাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির কথা আজও মনে আছে। যেমন— কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন', কাশীরাম দাসের 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভা' এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'কৈলাসবর্ণন'। কাশীরামের স্বয়ম্বরসভাবর্ণনার

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥

ইত্যাদি অংশের রচনাকৌশল ও ছন্দোবৈশিষ্ট্যে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, অন্নদামঙ্গলের

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস॥

এই রচনার ছন্দোবন্ধুরতায় তেমনি অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। ওই পাঠ্যপুস্তকে মধুসূদনের 'অশোকবনে সীতা' নামে একটি রচনাও ছিল যার আরম্ভে আছে

একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে।

এই অংশটুকুর ভাবসম্পদ্ তথা রচনাবৈশিষ্ট্যের প্রতি উদাসীন থাকতে পারিনি। কিন্তু আমার মনকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের দুটি রচনা। রবীন্দ্রনাথের

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

আর সত্যেন্দ্রনাথের

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল ?

এই দুটি রচনা ভাবের অভিনবতায় ও গভীরতায় আমার হৃদয়কে যেমন নিবিড়ভাবে অধিকার করেছিল, এ-দুটির নূতন ধরণের ছন্দের দোলাও তেমনি অননুভূতপূর্ব ভঙ্গিতে মনকে নাচিয়ে তুলেছিল। কিন্তু 'অক্ষর' গণনা করে এ দুই ছন্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তেমনি নিরাশ হতে হয়েছিল। এই অক্ষমতায় মনটা যে কতকখানি দমে গিয়েছিল তা আজও মনে আছে। প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ'-খানি তখন আমাদের ভালো করেই পড়তে হয়েছিল। এই ব্যাকরণের শেষের দিকে একটি অধ্যায়ে ছিল ছন্দের আলোচনা। এই অধ্যায়টা ইস্কুলে পড়ানো হত না। কিন্তু সে অধ্যায়টার প্রতি আমার আগ্রহ কম ছিল না। এই অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের যে বিবরণ দেওয়া ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই বিশ্লেষণ করা গেল। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হল না। এমন কি, অমিত্রাক্ষর বন্ধের অভিনবত্বও অনায়াসেই উপলব্ধি করা গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের উল্লিখিত কবিতা-দুটির ছন্দ কিছুতেই বিশ্লেষণ করা গেল না। 'সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণে' বিভিন্ন ছন্দের যে বিবরণ দেওয়া ছিল তার প্রায় সবগুলিরই মূলনীতি ছিল 'অক্ষরগণনা'। আর ছিল তোটক তূণক ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের বর্ণনা। সেগুলিও অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যদিও অক্ষরগুলি বিভিন্ন ছন্দে লঘুগুরুভেদে বিভিন্ন প্রণালীতে সজ্জিত। এই দুই উপায়ের কোনো উপায়েই ও-দুটি কবিতার ছন্দ নিরূপণ করা গেল না। এই অভাববোধের দুঃখ আমার মন থেকে কখনও যায়নি। মনে হয়েছিল, এই

ছন্দের অধ্যায়টা নূতন করে রচিত হওয়া উচিত যাতে সমস্ত ছন্দেরই যথাযথ বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়।

আরও বছরতিনেক পরে আমাদের পড়তে হল নেস্‌ফীল্‌ডের ইংরেজি ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণের শেষভাগেও ছিল একটি ছন্দের অধ্যায়। এই অধ্যায়ে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ইংরেজি ছন্দোনীতি ও ছন্দোবন্ধের যে সতর্ক বিশ্লেষণ ও প্রণালীবদ্ধ সুশৃঙ্খল বিবরণ দেওয়া ছিল, তার তুলনায় বাংলা ছন্দ-ব্যাকরণের দুর্বলতাটা আরও গভীরভাবে অনুভব করলাম। এই সময়ে *Lahiri's Select Poems*-নামক ইংরেজি কবিতার বইটি আমাদের পড়তে হত। নেস্‌ফীল্‌ড-ব্যাকরণের সূত্র ধরে এই সংকলনপুস্তকের কবিতাবলীর ছন্দোনিরূপণ করা গেল অনায়াসেই, কোথাও খটকা লাগল না। মনে হল বাংলা ব্যাকরণের সূত্র ধরে এভাবে বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করা যায় না কেন।

ইতিমধ্যে আমাদের বিদ্যালয়লব্ধ সংস্কৃতজ্ঞানও কিছু অগ্রসর হয়েছে। আমাদের বিদ্যাপ্রসারের দিকে, বিশেষতঃ কালিদাসের রচনার সঙ্গে পরিচয়-সাধনের দিকে, আমাদের সংস্কৃতশিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহ ছিল প্রচুর। এই সময়েই হাতে এসে পড়ল সংস্কৃত 'ছন্দোমঞ্জরী' বইখানি। এই বইএর সাহায্যে ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা, রুচিরা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত ছন্দের পরিচয় পাওয়া গেল। সংস্কৃত ছন্দোনীতির স্বাতন্ত্র্য এবং বিভিন্ন ছন্দের অপূর্ব বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য মনের মধ্যে এক নূতন আনন্দের সঞ্চার করল। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসাদে ও নিজের আগ্রহে কালিদাসের রচনার যে রস উপভোগ করা গিয়েছিল, ছন্দরস-উপলব্ধি ছিল তার অত্যাজ্য অঙ্গ।

ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের মৌলিক পার্থক্যবোধ বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ের প্রতি মনকে আরও উন্মুখ করে তুলল। এই মানসিক প্রবণতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল আমার ছন্দবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধগুলিতেই।

বাংলা ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যনিরূপণের প্রচেষ্টাও শুরু হল। তার একটা সুযোগও জুটে গেল অবিলম্বেই। ইস্কুলের উচ্চতর বর্গের ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটা হাতে-লেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হল। পত্রিকাটির নাম রাখা গেল 'নবযুগ'। সম্পাদকতার গুরুদায়িত্ব পালনের অত্যুৎসাহে কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটল না। এই সম্পাদকীয় কর্তব্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল সহপাঠীদের রচিত কবিতাবলীর ছন্দসংশোধন বা ছন্দের উন্নতিবিধান। কাজটা

বড় সহজ ছিল না। সমবয়সী সহপাঠী কবিযশঃপ্রার্থীদের রচনার ত্রুটি বা দুর্বলতা সম্বন্ধে তাদের আপত্তি নিরসন করা সুসাধ্য নয়। অনেক যুক্তিতর্ক ও তথ্য দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করতে হত। এই উপলক্ষে বিচিত্র ছন্দের কবিতা পড়তে হয়েছিল প্রচুরপরিমাণে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূলগত ছন্দোনীতি আবিষ্কারের প্রতিও মনোনিবেশ করতে হয়েছিল গভীরভাবে। কারণ তর্কযুদ্ধে সমকক্ষের সম্মুখীন হতে হলে যথোচিতরূপে অস্ত্রসজ্জিত হওয়া চাই। শুধু কানের দোহাই দিয়ে লড়াই ফতে করা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রতিপক্ষেরও তো কানের দোহাই দেবার অধিকার ছিল সমভাবেই। এই লড়াইএ যে মাঝে মাঝে পিছু হটতে হয়নি তাও নয়। একবার স্বোদ্‌ভাবিত যে ছন্দোনীতির অস্ত্র নিয়ে লড়াই ফতে করতে চেয়েছি, পরের বার সে ছন্দোনীতিটাকেই পুনর্বিচার করতে এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছি। সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালের কথা। স্বমতের পুনর্বিচারের বা উন্নতি-বিধানের প্রবণতা তথা প্রক্রিয়া আজও শেষ হয়েছে বলা যায় না।

শুধু যে সতর্ক বিচারবিশ্লেষণের পথেই ছন্দোনীতি-নিরূপণের দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তা নয়। সমকক্ষদের তাড়নায় সক্রিয় পরীক্ষণ এবং সংগঠনের পথেও এগোতে হয়েছিল। অর্থাৎ ছন্দ-রচনাতেও হাত পাকাতে বাধ্য হয়েছিলাম, প্রথমে গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে। দেখা গেল প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করবার পক্ষে এটাই সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। এই হাত পাকাবার অভ্যাস দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। তার ফসলের পরিমাণও কম হয়নি। কিন্তু সেগুলি সবই মরশুমী, প্রয়োজনের ঋতুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ছন্দপ্রবন্ধগুলিতে তার কিছু অবশেষ এখনও রয়ে গেছে। প্রথমপ্রকাশিত প্রবন্ধেই তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে।

২

যে সময়ে আমার বালকজীবনে এই ছন্দজিজ্ঞাসা দেখা দেয় সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র ছন্দের বান ডেকে চলেছে। প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় প্রতি মাসেই নানা ছন্দের যে ঐকতান-উৎসব চলছিল, আমার কান আশ মিটিয়ে তার মাধুর্য পান করেছে। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় -প্রমুখ

কবিদের সমবেত ছন্দসংগীতে বাংলাসাহিত্যের আসর যেভাবে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিছু তুলনা হতে পারে বৈষ্ণবযুগের সঙ্গে। এ কথা সত্য যে, "বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলাসাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে" (রবীন্দ্রনাথ)। বস্তুতঃ বৈষ্ণবপদাবলী-যুগের ছন্দোবৈভব বাংলাসাহিত্যে পরম গৌরবের বস্তু। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক, এই প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নবছন্দপ্রবর্তনার বেগ দ্রুতসঞ্চারিত হয়ে ও অচিরাৎ মহাকল্লোলের রূপ ধারণ করে বাংলা সাহিত্য-জগৎকে যেভাবে মুখরিত করে তুলেছিল, তার তুলনায় বৈষ্ণবপদাবলীর ছন্দ-সমৃদ্ধিও অকিঞ্চিৎকর বলেই প্রতীয়মান হবে। এই যুগের বাংলাকাব্য-আত্মার অন্যতম মুখ্য বাণীই যেন ভাষা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উক্তিতে।—

এক। টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নবসংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

—'সোনার তরী', বিশ্বনৃত্য (১৮৯৩)

দুই। নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।

—'চিত্রা', অন্তর্যামী (১৮৯৪)

বাংলাসাহিত্যে ছন্দ-উদ্‌ভাবনার এই স্বর্ণযুগেই যে আমার ছন্দচেতনার জাগরণ ঘটেছিল, এটাকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলেই মনে করি।

মা, তোর মুখের বাণী
আমার কানে
লাগে সুধার মতো।

অন্তরের মধ্যে অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিলাম যে, বাংলাবাণীর এই অমৃতরসের অনেকখানিই নিহিত ছিল তার বিচিত্র ছন্দসম্পদের মধ্যে। এই বৈচিত্র্যানুভূতির বিস্ময়ই আমাকে প্রবর্তিত করেছিল তার কক্ষে কক্ষে বিচরণ করে তার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের দিকে।

এই প্রবর্তনা কেবল আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হতেই পারে না। আমার অগ্রগামীদের মধ্যেও যে তার ক্রিয়া চলছিল তার কিছুকিছু নিদর্শন পেয়েছিলাম তৎকালীন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে। যে সময়ে আমি আমার সহপাঠী কাব্যকারদের সঙ্গে ছন্দবিতর্কে নিরত ছিলাম সে সময়ে প্রকাশিত এই ছন্দপ্রবন্ধগুলির প্রতি আমার আগ্রহের সীমা ছিল না। আমার তৎকালীন ছন্দজিজ্ঞাসাই যে এই আগ্রহের একমাত্র কারণ তা নয়। তার ব্যাবহারিক প্রয়োজনও ছিল। যেখান থেকেই হক, ছন্দের মূলনীতির সন্ধান পাওয়া গেলে সেটাকে হাতে-কলমে ছন্দপরীক্ষণের কাজেও লাগানো যাবে, আর তাতে সহপাঠী বন্ধুদের ছন্দরচনায় সহায়তাও করা যাবে, তাও ছিল এই আগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো প্রবন্ধের দ্বারাই আমার জিজ্ঞাসার তৃপ্তি ঘটল না।

এখানে তৎকালপ্রকাশিত ছন্দপ্রবন্ধগুলির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ১৩২১ সালের গোড়ার দিকে বাংলা সাময়িক পত্রিকায় পরপর তিনটি ছন্দ-আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই তিনটির মধ্যে কবি শশাঙ্কমোহন সেনের 'বাঙ্গালা ছন্দ' প্রবন্ধটিই[১] (১৩২০ চৈত্র ২৭ তারিখে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত) বোধ করি অগ্রণীত্বের অধিকারী। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশের (১৩২১ আষাঢ়) সঙ্গে সঙ্গেই অসীম আগ্রহ নিয়ে প্রবন্ধটি নিজেও বারবার পড়েছি, সহপাঠী বন্ধুদেরও পড়ে শুনিয়েছি এবং ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনেও তৃপ্তি পেলাম না, বন্ধুদেরও সন্তুষ্ট করা গেল না। আমার অতৃপ্তির কারণ যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে ছন্দোবিশ্লেষণ- ও নীতিনিরূপণ -প্রয়াসের অভাব। আমার বোধ হয়েছিল কবিসুলভ ভাবোচ্ছ্বাস ও তত্ত্বকল্পনার প্রভাবে বাংলা ছন্দের সত্যরূপটিকেই যেন আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছিল এবং ফলে ছন্দের বিভিন্ন নীতিসূত্রের মধ্যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তাই এই প্রবন্ধটি আমার মনে কোনো স্থায়ী ছাপ রাখতে পারেনি। তার চেয়ে স্পষ্টতর সত্যের আভাস পেয়েছিলাম সবুজপত্রে প্রকাশিত (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথের

---

১ এটি পরে কিছু পরিমার্জিতরূপে লেখকের 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থে (১৯১৫) সংকলিত হয় 'বাঙ্গলা ছন্দঃ' নামে।

দুটি পত্রপ্রবন্ধ থেকে। কিন্তু এ-দুটিতেও বাংলা ছন্দের রূপবিশ্লেষণ ও নীতিনিরূপণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল না। এর কিছুকাল পরে প্রবাসীতে (১৩২২ অগ্রহায়ণ) বিজয়চন্দ্র মজুমদারের একটি প্রবন্ধ ('কবিতার ভাষা ও ছন্দ') প্রকাশিত হয়। এটিতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নিয়ে ছন্দোবিশ্লেষণের প্রয়াস সুস্পষ্ট। তাতে ছন্দোনীতির কোনো কোনো বিশেষ দিক্ নিয়ে কিছু নিপুণ আলোচনাও আছে, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ এবং ছন্দজিজ্ঞাসুর তৃপ্তিবিধানে অক্ষম।

এর কিছুকাল পরে সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটির নাম 'সংগীতের মুক্তি' (১৩২৪ ভাদ্র), অপরটির নাম 'ছন্দ' (১৩২৪ চৈত্র)। প্রথমটিতে গানের তালের সঙ্গে বাংলা ছন্দপর্বের সাদৃশ্যের দিক্‌টা বেশ সুস্পষ্টরূপেই ফুটে উঠেছে। বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের ছন্দদৃষ্টি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয় সংগীতদৃষ্টির দ্বারা।

> 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
> তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।'—

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁর ছন্দ-আলোচনার সম্পর্কেও অনেকপরিমাণে সত্য। এই গানের দৃষ্টি তাঁর উক্ত 'ছন্দ' প্রবন্ধটিতেও প্রকাশ পেয়েছে, এক হিসাবে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধের চেয়ে গভীরতর ও সূক্ষ্মতর ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এই প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে এমন আরও অনেক কথা আছে যার গুরুত্ব সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দপ্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, এগুলি সবই ছন্দরচনার দৃষ্টি নিয়ে লেখা, ছন্দব্যাকরণের দৃষ্টি নিয়ে নয়; এ দৃষ্টি স্রষ্টার, বিশ্লেষকের নয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাশিল্পীর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া কম লাভ নয়, কিন্তু শিল্পরচনার ও ব্যাকরণবিশ্লেষণের দৃষ্টি দুই ভিন্ন জাতের জিনিস। এই দুই দৃষ্টি পরস্পরবিরোধী না হলেও তাদের ক্ষেত্র পৃথক্, তাদের সার্থকতাও স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী'-নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধটি[২] (ভারতী ১৩২৫

২ সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী' ও রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ', এই দুটি প্রবন্ধই 'বিচিত্রা' ক্লাবে পঠিত হয় ১৩২৪ সালে। পাঠের তারিখ যথাক্রমে ১৫ই ফাল্গুন এবং ৬ই চৈত্র। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৩৬৯ সংস্করণ), পৃ ৩৫৪–৫৯।

বৈশাখ)। এই প্রবন্ধটিতে নিছক বিশ্লেষণের অভিপ্রায়কে অন্তরালে রেখে রচনারসসৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি এই রচনাটিতে অলংকৃত ভাষার ও রূপকজালের আড়াল থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য নানাভাবে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী- ও ভাষা -প্রয়োগের অভাবে ছন্দজিজ্ঞাসুর আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থেকে যায়। তা ছাড়া, ছন্দব্যাকরণের অনেকগুলি প্রধান বিষয়ই এই প্রবন্ধের আওতার মধ্যে পড়েনি।

বলতে ভুল হয়েছে যে, এরই মধ্যে কোনো সময়ে (বোধ করি শশাঙ্কমোহনের প্রবন্ধ পড়বার আগেই) দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যের (১৩১৪ বৈশাখ) ভূমিকা থেকে বাংলা লৌকিক রীতির ছন্দসম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গির তথা সৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে খুবই বিস্মিত হই। কিন্তু ওই স্বল্পায়তন আলোচনার অপূর্ণতা ও পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগের অনির্দিষ্টতা আমার অভাববোধ মেটাবার পক্ষে অন্তরায়স্বরূপই হয়েছিল।

এতগুলি প্রবন্ধ পড়েও আমার অশান্ত ছন্দজিজ্ঞাসার শান্তিবিধান হল না। বরং এগুলি আমার অতৃপ্তিকে বাড়িয়েই তুলল। এই অতৃপ্তির প্রেরণাতে অবশেষে নিজেই অগ্রসর হলাম ছন্দব্যাকরণ রচনার দিকে। আমার স্বল্প শিক্ষা ও স্বল্পতর শক্তি সম্বন্ধে আমি অচেতন ছিলাম না। কি যে কুণ্ঠা- ও দ্বিধা-গ্রস্ত চিত্ত নিয়ে এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তা আজও ভুলতে পারি নি। কেবলই মনে হচ্ছিল, 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ'। তবু যে আমি এ পথে চলতে উদ্যত হয়েছিলাম তার কারণ আছে। এতদিন পর্যন্ত যাঁরা ছন্দ-আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা সকলেই কবি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও শশাঙ্কমোহনের প্রবন্ধগুলি পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, জাত-কবিদের পক্ষে শিল্প ও ব্যাকরণকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব না হলেও সুসাধ্য নয়, অর্থাৎ অমিশ্র ব্যাকরণবুদ্ধি জাত-কবিদের কাছে প্রত্যাশিত নয়, প্রত্যাশা করা উচিতও নয়। অতএব এ কাজে অ-কবিদেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। সেইজন্যই আমি একান্ত ভয়ে ভয়ে হলেও নিছক ব্যাকরণবুদ্ধিকে সম্বল করেই এ কাজে ব্রতী হতে সাহসী হয়েছিলাম। আমার প্রথম প্রবন্ধ পাঁচ মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল প্রবাসী পত্রিকায় (১৩২৯ পৌষ-চৈত্র এবং ১৩৩০ বৈশাখ)।

৩

আমার এই প্রথম প্রচেষ্টা অপ্রত্যাশিতরূপে পুরস্কৃত হল নানা দিক্ থেকে। পুরস্কার এল রবীন্দ্রনাথের মতো কবির এবং স্থনীতিকুমারের মতো ভাষাচার্যের হাত থেকে। কবি মোহিতলালের কাছে যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তাও উপেক্ষণীয় নয়। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে পরে শুনেছি আমার প্রবন্ধটি পাঠানো হয়েছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। তিনি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সানন্দ অনুমোদনের ফলেই লেখাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পরে এটি সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করবেন, এ অভিপ্রায়ও জানিয়েছিলেন। আমার পক্ষে গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, তার পূর্বেই তাঁর অকালতিরোধান ঘটে (১৩২৯ আষাঢ়)।

কিন্তু প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে এটির অপূর্ণতা ও ত্রুটিগুলি অন্যের দৃষ্টি এড়ালেও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। আমার আত্মপরীক্ষণের প্রবৃত্তি তখনও নিষ্ক্রিয় হয়নি। ফলে রবীন্দ্রনাথ, স্থনীতিকুমার -প্রমুখ অনেকের কাছ থেকে পুনঃপুনঃ উৎসাহ পাওয়া সত্ত্বেও এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উৎসুক হইনি। আমার ছন্দজিজ্ঞাসা এগিয়েই চলল। লক্ষ্য হল এই প্রবন্ধটির সমস্ত অপূর্ণতা ও ত্রুটি নিরসন করে একটি পূর্ণাঙ্গ ছন্দব্যাকরণ রচনা করা।

বারবার সে কাজে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু বারবারই বাধা পেয়ে সে কাজ আজও অপূর্ণ ই রয়ে গেছে। সে বাধা কখনও এসেছে ভিতর থেকে অর্থাৎ নিজের মানসিক তৃপ্তিবোধের অভাব থেকে, কখনও এসেছে বাইরে থেকে অর্থাৎ প্রতিপক্ষ পাঠকদের পরিতৃপ্ত করবার অক্ষমতা থেকে। বাইরের বাধার ইতিহাসটাও সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বার সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছন্দব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হই ১৩৩৭-৩৮ সালে (ইং ১৯৩১)। তারই পূর্বাভাসস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্-মন্দিরে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিই (১৩৩৮ ভাদ্র) এবং বিচিত্রা পত্রিকায় 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ)। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে বাংলা ছন্দ নিয়ে একটা বাদপ্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রথম প্রতিবাদ আসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, সে প্রতিবাদের আঘাতও খুব সামান্য ছিল না। অতঃপর সেই ছন্দবিতর্কের রণক্ষেত্রে

অমূল্যধন, দিলীপকুমার, মোহিতলাল, সজনীকান্ত -প্রমুখ আরও অনেকেই অবতীর্ণ হন। সে ছন্দসংগ্রামের কিছু ইতিহাস পাওয়া যাবে এই তিনটি গ্রন্থে।—

১ রবীন্দ্রনাথ— 'ছন্দ' (১৩৬৯), বিজ্ঞপ্তি এবং পাঠপরিচয়, পৃ ৩৮০-৪১৩ ;
২ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়— 'বিগত দিন' (১৩৬৪), অধ্যায় ৭-৮ ;
৩ দিলীপকুমার রায়— 'স্মৃতিচারণ' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৬৮), পৃ ১৪২-৪৬।

এই তর্কবিতর্কের যুগে দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রবন্ধ লিখে নিজের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে উত্তরোত্তর অধিকতর সহজবোধ্য করে তুলতে প্রয়াসী হতে হয়েছিল। তাতে নিজের ছন্দবোধকে গভীরতর করে তোলবার পক্ষে খুবই সহায়তা হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ঝড়ের বেগে ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প বানচাল হয়ে গেল। অনেক প্রবন্ধ লেখা হল বটে, কিন্তু বই লেখা আর হল না।

এইভাবে আমার ছন্দজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব (১৩৩৭-৪৪) উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তৃতীয় পর্বে ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প আপাততঃ স্থগিত রেখে রবীন্দ্রসাহিত্যে ছন্দোবিবর্তনের প্রতি মনোনিবেশ করা গেল। তার ফল 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ (১৩৫২ আষাঢ়)। তখন আধুনিক বাংলা ছন্দের বিবর্তনধারা অনুসরণের ইচ্ছাও আমার ছিল। সুসময়ে ছন্দজিজ্ঞাসু ছাত্র নীলরতন সেনের গবেষণানিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে তার উপরেই এ কাজের ভার দেওয়া গেল। তাঁর বহু বৎসরের প্রচেষ্টায় আমার এই ইচ্ছা অনেকাংশেই সফল হয়েছে। তাঁর 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' বইখানি (১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ) ছন্দচর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে।

এই সময়ে ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প আবার জেগে ওঠে। তার জন্য পুনঃ-প্রস্তুতির কাজও শুরু হয়। এই প্রস্তুতির কিছু পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে 'বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র' প্রবন্ধটিতে (১৩৫২ আশ্বিন)। পূর্ববর্তী ছন্দবিতর্কের যুগেই বোঝা গিয়েছিল যে, এই কোলাহলের অন্যতম মূলকারণ হল সুষ্ঠু, অর্থাৎ দ্ব্যর্থহীন সহজবোধ্য ও সুনির্দিষ্ট, পরিভাষার অভাব। তাই নূতন করে বিচারসহ ও স্বতঃস্বীকার্য পরিভাষার সন্ধানে ব্রতী হতে হয়েছিল। এই কাজ শুরু হয় ছন্দচর্চার প্রথম পর্বেই, তৃতীয় পর্বেও তার সমাপ্তি হয়নি। তথাপি এই পর্বেই পরিভাষা-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তির অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল, এ কথা বলা যায়। তার

কিছুকিছু পরিচয় আছে এই সময়কার ও পরবর্তী কালের অনেক মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ছন্দপরিভাষা'-নামক প্রবন্ধটি (১৩৫৫ মাঘ)। এ প্রবন্ধটি লিখিত হয় ছন্দব্যাকরণ রচনার নবোদ্যমের পূর্বাভাসরূপে। এটিতে প্রায় সমস্ত পারিভাষিক শব্দের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে সবিস্তারে আমার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করি। অতঃপর এই প্রবন্ধের প্রায় পঞ্চাশটি মুদ্রিত কপি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান কবি, ছান্দসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ছন্দশিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের অনুকূল বা প্রতিকূল অভিমত জানতে চাই, যাতে তাঁদের মতামতের সহায়তায় নিজের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার করবার সুযোগ পাই। কিন্তু তার ফলটা খুব উৎসাহজনক হয়নি। কারণ অধিকাংশের কাছ থেকে শুধু সৌজন্যসূচক উত্তরই পেয়েছিলাম। একমাত্র কবি মোহিতলাল সৌজন্য না জানিয়ে সমর্থনই জানিয়েছিলেন, যদিও তিনি কোনো পারিভাষিক শব্দের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অভিমত প্রকাশ করেননি। সুতরাং নিজের পথ নিজে রচনা করবার নীতিকেই আশ্রয় করতে হল। তখন থেকে ওই প্রবন্ধে স্বীকৃত পরিভাষাগুলি অনুসরণ করে চলছি। তাই ওই 'ছন্দপরিভাষা' প্রবন্ধটিকে কিছু পরিমার্জিত করে এই পুস্তকে স্থান দেওয়া গেল 'পরিভাষা-পরিচয়' নামে।

এই তৃতীয় পর্বেও যে ছন্দবিতর্ক সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়নি, তার কিছু নিদর্শন আছে তৎকালীন 'উত্তরা' ও 'কবিতা' পত্রিকায়। তবে আমি নিজে এই বিতর্ক থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই কাম্য মনে করেছিলাম। আর বিতর্কটাও প্রত্যক্ষতঃ আমাকে স্পর্শ করেনি। শুধু দুইবার 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইটির বিরুদ্ধ সমালোচনা উপলক্ষে আমার নামটা তার সঙ্গে কিছু জড়িত হয়েছিল। দিলীপকুমারের সমালোচনার একটা উত্তর দেওয়া কর্তব্য বোধ করেছিলাম 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে (১৩৫২ ফাল্গুন)। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৫২ চৈত্র) বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে, এই আশঙ্কায় তার থেকে বিরত থাকি। বুদ্ধদেবের এই প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে (১৩৬১ বৈশাখ) সংকলিত হয় 'বাংলা ছন্দ' নামে। বহু বৎসর পরে ইদানীং 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পয়ার-পরিচয়' প্রবন্ধে (১৩৭১ আষাঢ়) বুদ্ধদেবের উক্ত প্রবন্ধটির কিছু সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে। এই প্রবন্ধটিও বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হল পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে।

আমাদের ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে ছন্দ-অধ্যায়ের অপূর্ণতা দেখে ছেলেবেলায় মনে যে খেদ দেখা দিয়েছিল, সে খেদও অন্ততঃ কিছুপরিমাণে মেটাবার সুযোগ এল এই তৃতীয় পর্বে। জগদীশচন্দ্র ঘোষের 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'-খানির ছন্দ-অধ্যায়টির সংস্কারসাধনের অনুরোধে কয়েক সংস্করণেই অধ্যায়টির কিছুকিছু উন্নতিবিধান করা গেল। এভাবে কয়েক বৎসরে এই অধ্যায়টি প্রায় সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিতে দেখা দিল। গ্রন্থের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে রেখে সংস্কার করতে হত বলে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায়নি বটে, কিন্তু ছেলেবেলার একটা খেদ মেটাবার এটুকু সুযোগের মূল্যও আমার কাছে কম মনে হয়নি। এই পর্বের অন্যান্য প্রবন্ধ রচিত হয় নানা উপলক্ষে। তার ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নয়।

চতুর্থ পর্বের প্রধান ফসল রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ -সম্পাদন ও রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ রচনা। সবগুলিই রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রচিত ও প্রকাশিত।

এই দীর্ঘকাল (১৩২৮-৭১) ধরে প্রায় অবিশ্রান্তভাবে প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারা স্বভাবতঃই নানা বাঁক ঘুরে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এই প্রবন্ধপ্রবাহ আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারার অগ্রগতির তথা গতিপরিবর্তনের পথরেখা অঙ্কিত করে চলেছে। কালের গতির সঙ্গে চিন্তার গতি অনুসরণেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে। এ বিষয়ে উৎসুক লোকের সংখ্যা কম নয়। তাঁদের ঔৎসুক্য প্রশমনের অভিপ্রায়ে আমার ছন্দচিন্তাবিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করলাম এবং তাঁদের পথ সুগম করবার জন্য আমার ছন্দবিষয়ক রচনাসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করলাম। বলা বাহুল্য, অন্যান্য ছান্দসিকদের প্রবন্ধাবলীও নানা পত্রপত্রিকায় বিকীর্ণ হয়ে আছে। তবে সুখের বিষয় তার অধিকাংশই গ্রন্থাকারে সহজপ্রাপ্য। এখনও যা গ্রন্থভুক্ত হয়নি তার সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু আমার লিখিত প্রবন্ধাবলী গ্রন্থভুক্ত হয়ে সহজলভ্য হয়নি, বারবার এই অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অপরাধ অস্বীকারেরও কোনো উপায় নেই। কিছুপরিমাণে এই অপরাধ ক্ষালনের অভিপ্রায়েও বর্তমানে এই তালিকা সংকলন করা গেল। এগুলিকে গ্রন্থাকারে সংকলনের পরিকল্পনাও করা গিয়েছে। আশা করি তার প্রথম কিস্তি হিসাবে 'ছন্দজিজ্ঞাসা' প্রথম পর্ব প্রকাশিত হতে দেরি হবে না। এখানে বলে রাখতে চাই যে, ঐতিহাসিক মূল্যই এই প্রবন্ধসমূহের

একমাত্র সম্বল নয়, এগুলির স্থায়ী মূল্যও উপেক্ষণীয় নয় বলেই বিশ্বাস করি। নতুবা এগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছামাত্রও করতাম না। বর্তমান গ্রন্থখানি খণ্ডশঃ প্রকাশিতব্য উক্ত 'ছন্দজিজ্ঞাসা'র উপক্রমণিকা-রূপেই গ্রহণীয়

এই যে অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া গেল তার আর-একটা দিকের কথাও উল্লেখ করা উচিত। প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের ছন্দচর্চা ও প্রবন্ধরচনার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের সময় থেকে বহু ছন্দজিজ্ঞাসুর বহু সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে হাতে-কলমে। বুঝতে পেরেছি এটাও বড় সহজ কাজ নয়। এদের মধ্যে যেমন ছিল অল্পবয়সের শিক্ষার্থী, তেমনি ছিলেন পরিণতবুদ্ধি অভিজ্ঞ ব্যক্তিও। আমার পক্ষে তার চেয়েও সহায়ক হয়েছে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করব, কলেজের অগ্রগামী ছাত্রদের ছন্দশিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁদের যত শিখিয়েছি, তার চেয়ে নিজে শিখেছি অনেক বেশি। ছন্দোনীতিকে তাঁদের কাছে স্পষ্ট ও সুষ্ঠুরূপে উপস্থাপিত করতে গিয়ে নিজের চিন্তাকেই স্বচ্ছতর ও পরিচ্ছন্নতর করবার প্রয়াস করতে হয়েছে অবিরত। সময়ে সময়ে মেধাবী ছাত্রদের বুদ্ধিসমুজ্জ্বল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সমস্যাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখতে বা নূতনভাবে বিচার করতেও প্রণোদিত হয়েছি। তাদের সকলকেই আজ সুগভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

ছন্দপরিক্রমা

বর্তমান পুস্তকখানি রচনার মূলে রয়েছে পূর্বাশা-সম্পাদক স্নেহভাজন কবি শ্রীমান্ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহু ছন্দজিজ্ঞাসু ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের আগ্রহ ও অনুরোধ। আসলে এ সময়ে এজাতীয় ছন্দগ্রন্থ প্রকাশের কোনো পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে শ্রীমান্ সঞ্জয় পয়ারসম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন ও সমস্যা উত্থাপন করে এ বিষয়ে পূর্বাশায় একটা প্রবন্ধ লেখবার জন্য বারবার অনুরোধ জানান। এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি বহুকাল পূর্বেই, বিশেষতঃ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের পূর্বোক্ত 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি পড়বার সময় থেকে। কিন্তু যথেষ্ট প্রেরণার অভাবে এতদিন এ বিষয়ে কিছু লেখার আগ্রহ বোধ করিনি। এবার যখন পূর্বাশার জন্য লেখা

শুরু করলাম তখন স্বতঃই মনের মধ্যে আগ্রহের বেগ দেখা দিল। মনে হল একে তো পয়ারবন্ধটা গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য উভয় দিক্ থেকেই সমস্ত বাংলা ছন্দোবন্ধের শীর্ষস্থানীয়, তার উপরে এটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবটাও বেশ ব্যাপক, সুতরাং এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধই লেখা উচিত। 'পয়ার-পরিচয়' প্রবন্ধটি তারই ফল। এটি লিখতে গিয়ে সব সময়ই মনে রাখতে হয়েছিল যে, এটিকে পূর্বসংস্কারনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে উপস্থাপিত না করলে এর উদ্দেশ্যই অনেকাংশে ব্যর্থ হবে, পাঠকমনের পূর্বলব্ধ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধতায় পয়ারবন্ধের যথার্থ স্বরূপ-উপলব্ধির অন্তরায় ঘটবে। তাই কোনো দিকে ভ্রান্তির কোনো অবকাশ না রেখে প্রবন্ধটি যাতে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়েছিল। পয়ারের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে বাংলা ছন্দের মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। তাই এটিতে ছন্দের মূলনীতিগুলিকেও সংক্ষেপে পরিস্ফুট করতে চেষ্টিত হয়েছি, যাতে ছন্দোনীতির সাধারণ জ্ঞানের আলোতে পয়ারবন্ধের বিশেষ জ্ঞান লাভের সহায়তা হয়। ফলে পয়ারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার উপলক্ষে এই প্রবন্ধটিকে একটি সংক্ষিপ্ত ছন্দব্যাকরণের রূপ দিতে হয়েছিল।

এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হল না। কোনো কোনো ছন্দবুদ্ধি-সম্পন্ন পাঠক এই অভিমত জানালেন যে, এটিকে পুস্তিকা-আকারে প্রকাশ করলে তাতে জিজ্ঞাসুদের ছন্দজ্ঞানলাভের ও পয়ার সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা-নিরসনের বিশেষ সহায়তা হবে। তাঁদের যুক্তি উপেক্ষণীয় নয় মনে করে প্রবন্ধটিকে পরিমার্জিত করতে প্রয়াসী হলাম। মাসিকপত্রিকালভ্য নির্দিষ্ট পরিসরের কথা বিবেচনা করে যেসব বক্তব্য বিষয়কে কিছু সংকুচিত করতে হয়েছিল সেগুলিকে বিশদ করা গেল এবং যেসব উক্তিতে কিছু অস্পষ্টতা ছিল বলে কারও কারও মনে হয়েছিল সেগুলিকে স্পষ্টতর করা গেল। অতঃপর তাঁদেরই কারও কারও অনুরোধে প্রবন্ধটির শেষে পূর্বপ্রকাশিত 'ছন্দপরিভাষা' প্রবন্ধটিকে পুনঃসংস্কৃত রূপে যোগ করে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হল। সর্বশেষে এই মন্তব্যও এল যে, পয়ার-পরিচয়ের মুখবন্ধরূপে বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ যুক্ত হলে পুস্তিকাটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়। এই মন্তব্যের সঙ্গে যে অনুরোধ যুক্ত ছিল তাও উপেক্ষা করা গেল না।

এই হল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির ইতিহাস। এর থেকে

সহজেই বোঝা যাবে, বইটিতে সম্পূর্ণতা থাকলেও তাতে অখণ্ডতা নেই এবং সমতার অভাবও আছে। কারণ এটি একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে রচিত নয়। এর তিনটি অধ্যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। কিন্তু এই বিভিন্ন উদ্দেশ্য একই মূল অভিপ্রায়ের বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ একান্তভাবে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নয়। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছন্দ বিষয়টাকে অধিগত করার পক্ষে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর এইজন্য প্রতি অধ্যায়ে কিছুকিছু পুনরুক্তির দায়ও মেনে নিতে হয়েছে। এই পুনরুক্তির নিরসন ঘটিয়ে এ অধ্যায়গুলিকে পরস্পরসাপেক্ষ করা হয়তো কঠিন হত না। কিন্তু তাতে বিষয়বস্তুর স্বগমতার কিছু হানি ঘটত বলে মনে করি। এই বিশ্বাসেই বইটির সমগ্রতাবিধানে অগ্রসর হইনি।

তা ছাড়া তিনটি অধ্যায় তিনটি ক্রমোন্নত স্তরে বিন্যস্ত। এরূপ স্তরবিন্যাসে প্রায় অলক্ষিতভাবেই বিষয়বস্তুর উপরে পাঠকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বলে আমার ধারণা। আমার অধ্যাপকজীবনে আমি এই পথকে শিক্ষাদানসিদ্ধির পথ বলে মেনে নিয়েছি। এইজন্যই তিনটি অধ্যায়কে এক সমস্তরে নামিয়ে এনে বা তুলে নিয়ে গ্রন্থের সমতাবিধানে প্রয়াসী হইনি।

চিরাচরিত প্রথার অনুসরণে প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরে গ্রন্থ ও অধ্যায়ের নাম সন্নিবিষ্ট না করে আলোচিত প্রসঙ্গের নামোল্লেখ করাই সমীচীন মনে করেছি। আশা করি তাতে পাঠকের সহায়তা হবে। কোনো কোনো স্থলে কিছু ত্রুটিও লক্ষিত হতে পারে, সে ত্রুটি গুরুতর নয় বলেই মনে করি। প্রথম অধ্যায়ের প্রসঙ্গবিন্যাসেও কিছু ত্রুটি লক্ষিত হবে। অনবধানতাকৃত এই ত্রুটির অপরাধ শুধরে নিয়েছি অধ্যায়সূচিতে। পাঠক যদি এই অধ্যায়সূচির প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রন্থের বিভিন্ন প্রসঙ্গ অনুধাবন করেন, আশা করি তা হলে সমগ্রভাবে ছন্দ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে কোনো বাধা ঘটবে না।

বাংলা ছন্দের নীতি ও প্রণালী সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা-সৃষ্টির সহায়তা করাই এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকের কানের অভ্যাসগঠনে সহায়তা করা। ছন্দ বস্তুটা শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য হলেই চলে না, শ্রুতিগ্রাহ্যও হওয়া চাই। এইজন্য সূত্রব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করতে কার্পণ্য করিনি। বরং স্থলে স্থলে দৃষ্টান্তবাহুল্যই লক্ষিত হবে। আশা করি তাতে ছন্দের নীতিবোধের সঙ্গে শ্রুতিবোধও স্বতঃই তৈরি

হয়ে যাবে। 'শ্রুতবোধ'-নামক বহুখ্যাত সংস্কৃত ছন্দগ্রন্থখানির যা উদ্দেশ্য, এই গ্রন্থখানিরও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাই। তার সঙ্গে একটি পরোক্ষ অভিপ্রায়ও জড়িত আছে। ছন্দরস ও কাব্যরস পরস্পরের পরিপূরক, একের মধ্যে অন্যের সার্থকতা। কেননা, স্বভাবতঃই কাব্যের ভাব 'আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে'। তাই ছন্দের দৃষ্টান্তগুলি বাংলার শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে উদ্ধৃত করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি, যাতে নীরস ছন্দোবিশ্লেষণ অনুধাবনের ক্লান্তি কাব্যরস-অনুভূতির দ্বারা কিছুপরিমাণে অপনোদিত হয়। তা ছাড়া, সর্বত্রই উদ্ধৃতিগুলির উৎস-নির্দেশও করেছি, যাতে উৎসুক পাঠক মূলরচনার সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারেন এবং প্রয়োজনমতো গ্রন্থকারকৃত ছন্দোবিশ্লেষণের যাথার্থ্য বিচার করে দেখতে পারেন। যেসব রচনার ছন্দ সর্বস্বীকৃত আদর্শসম্মত, দৃষ্টান্তগুলি যথাসম্ভব তার থেকেই সংকলিত। যেসব রচনার ছন্দবিশুদ্ধি সন্দেহাতীত নয়, তার থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করলে ছন্দোনীতি-নিরূপণের ভিত্তিই টলে যায়। এইজন্য অধিকাংশ দৃষ্টান্তই সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। সেসব ক্ষেত্রে কবির নাম না করে শুধু গ্রন্থ ও কবিতার নাম উল্লিখিত হল। অন্য ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও কবিতার নামের পূর্বে কবির নামও দেওয়া হল। আর যে দু-একটি দৃষ্টান্তের কোনো পরিচয় দেওয়া নেই সেগুলি গ্রন্থকারের রচিত।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি পরবর্তী দুই অধ্যায়ের ভূমিকা হিসাবে রচিত। বস্তুতঃ এটি সমগ্র ছন্দব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ বলেও গণ্য হতে পারে। ফলে এই নবরচিত অধ্যায়টি অপরিণতবুদ্ধি প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষেও দুষ্প্রবেশ্য হবে না বলেই আশা করা যায়। কিন্তু পরবর্তী দুই অধ্যায় সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। ও-দুটি অধ্যায় অপেক্ষাকৃত পরিণতবুদ্ধি পাঠকের উপযোগী করেই লিখিত। তবে পাঠকদের মধ্যে যাঁরা পরিণতবুদ্ধি অথচ ছন্দ-বিষয়ে প্রথমশিক্ষার্থী, তাঁদের পক্ষে অধ্যায়-দুটি যাতে দুরধিগম্য না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

পক্ষান্তরে এই পুস্তকে সাধারণ নিয়মের সমস্ত ব্যতিক্রম, সমস্ত বিশেষ বিধি ও অন্যবিধ সমস্ত জটিল প্রশ্নের বিষয় সযত্নে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করেছি। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি প্রথমেই বিশেষ বিধি বা ব্যতিক্রমের বিষয় উপস্থাপন করলে তার জটিলতার জালে মূলনীতিগুলি প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, ফলে ছন্দোনীতিব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বলা উচিত যে, এই

বইটি অপেক্ষাকৃত পরিণতবুদ্ধি পাঠকের উপযোগী করে লিখিত হলেও বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য অভিপ্রেত নয়। তাই এর নাম 'ছন্দপরিক্রমা'। এর দ্বারা ছন্দসৌধের চার দিক্ পরিক্রমণ করে তার বহিরাকৃতি ও তার বিভিন্ন অবয়ব সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয়লাভ হতে পারবে, তার আভ্যন্তর রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হবে না। তার জন্য স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ছন্দব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন রইল।

যদি এই গ্রন্থের দ্বারা পাঠকচিত্তে কিছুমাত্র ছন্দজিজ্ঞাসার উদ্রেক হয় এবং তার ফলে সত্যনির্ণয়ের পথ একটুও সুগম হয় তা হলেই এই গ্রন্থরচনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে। সর্বশেষে নিবেদন এই যে, এই পুস্তকে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হবে, পাঠকগণ যদি অনুগ্রহ করে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হলে বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হব এবং ভবিষ্যতে তার অপনোদনে যত্নবান্ হব।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সোদরপ্রতিম কবি শ্রীমান্ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উৎসাহে। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এ-দুটি প্রবন্ধকে পুনঃসংস্কৃত ও একত্র সংবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সংকল্প দেখা দেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রীমান্ দেবীপদ ভট্টাচার্য ও প্রেসিডেনসি কলেজের স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রীমান্ ভবতোষ দত্তের প্রস্তাবক্রমে। সর্বশেষে এই পরিকল্পিত গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে তার প্রথম অধ্যায়টিও রচিত হয় তাঁদেরই অনুরোধে ও আগ্রহে।

গ্রন্থের রচনা ও মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বভারতীর বাংলা অধ্যাপনা-বিভাগের সহকর্মী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীমান্ রামবহাল তেওয়ারী এবং বাংলা গবেষণাবিভাগের ছাত্র শ্রীমান্ শ্রীমন্তকুমার জানা ও শ্রীমতী পম্পা ঘোষের সহায়তা পেয়ে উপকৃত হয়েছি। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি শ্রীমান্ ভবতোষের প্রগাঢ় ছন্দবোধ ও সতর্ক বিচারবুদ্ধির সহায়তা পেয়ে। গ্রন্থরচনার ও মুদ্রণের প্রত্যেক স্তরেই তাঁর উপরে নিঃসংশয়ে নির্ভর করতে পেরেছি। আমার কন্যা শ্রীমতী সংঘমিত্রা ও শ্রীমতী সুগতা গ্রন্থের ভাষাপরিমার্জনায় ও অন্য নানা বিষয়ে আমার শ্রমলাঘব করেছে। সর্বশেষে উল্লেখ করব

উৎসাহী প্রকাশক শ্রীমান্ শ্রীশকুমার কুণ্ডের নাম। তাঁর আন্তরিক আগ্রহেই গ্রন্থখানি এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন পরিপাট্যের সঙ্গে প্রকাশিত হতে পেরেছে। তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্যভাবে আমার কৃতজ্ঞতা, স্নেহ ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা। ৩ চৈত্র ১৩৭১

প্রবোধ চন্দ্র সেন

অধ্যায়সূচি

উপক্রম

ছন্দের মুখ্য পরিভাষা ও তিন রীতি

এখানে ছন্দের মুখ্য পরিভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুসরণের পক্ষে এগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

দল (syllable)—শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণবিভাগ। যেমন—বাল্. মী. কি, ছান্. দ. সিক্, মৌ. মা. ছি।

রুদ্ধ দল (closed syllable)—আশ্রিতান্ত দল, অর্থাৎ যে দলের অন্তে আশ্রিত (স্বাতন্ত্র্যহীন) ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণ থাকে। যেমন—বাল্, ছান্, সিক্, মৌ (=মউ্)।

মুক্ত দল (open syllable)—অনাশ্রিতান্ত দল, অর্থাৎ যে দলের অন্তে কোনো আশ্রিত বর্ণ থাকে না। যেমন—মী, কি, দ, মা, ছি।

কলা (mora)—উচ্চারণকালের একক। অপ্রসারিত মুক্ত ও রুদ্ধ দলে এক কলা এবং প্রসারিত মুক্ত ও রুদ্ধ দলে দুই কলা। যেমন—ছা-ন্. দ. সি-ক্=পাঁচ কলা, ছান্. দ. সি-ক্=চার কলা। হাইফেনচিহ্ন প্রসারণসূচক।

মাত্রা (unit of measure)—পরিমাপক। যে রীতিতে এক দলে এক মাত্রা তার নাম 'দলমাত্রিক', আর যে রীতিতে এক কলায় এক মাত্রা তার নাম 'কলামাত্রিক'। যে বিশেষ রীতিতে প্রসারিতসংকুচিতভেদে রুদ্ধদলের দ্বিবিধ উচ্চারণরূপের হিসাবে কলাগণনা হয়, সে রীতির নাম 'মিশ্রকলামাত্রিক'।

দলমাত্রিক রীতিতে 'ছান্. দ. সিক্'=তিন মাত্রা। এই রীতিতে এক দলেই এক মাত্রা।

কলামাত্রিক রীতিতে 'ছা-ন্. দ. সি-ক্'=পাঁচ মাত্রা। এই রীতিতে সব রুদ্ধ দলেরই প্রসারিত উচ্চারণ।

মিশ্রকলামাত্রিক রীতিতে 'ছান্. দ. সি-ক্'=চার মাত্রা। এই রীতিতে সাধারণতঃ শব্দের কেবল অন্তস্থিত রুদ্ধদলের উচ্চারণ প্রসারিত।

তিন রীতির নামভেদ

এক সময়ে আমি এই তিন রীতির নাম দিয়েছিলাম যথাক্রমে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। এই তিন নাম এখন সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত। তার পরে আর-এক সময়ে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তকে পরিচিত করেছিলাম যথাক্রমে লৌকিক ও যৌগিক নামে। এই নাম-দুটিও একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়। পরবর্তী কালে এসব নাম বর্জন করে দলমাত্রিক, কলামাত্রিক ও মিশ্রকলামাত্রিক নামকরণই সমীচীন মনে করি। বর্তমান গ্রন্থে স্বীকৃত দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত উক্ত তিন নামেরই রূপান্তর মাত্র। তা ছাড়া, অনেকে আবার রবীন্দ্রনাথ ও অমূল্যধনের দেওয়া নামে অভ্যস্ত। তাই নীচে এক দিকে এই গ্রন্থস্বীকৃত নাম, আর অপর দিকে গ্রন্থকারের পূর্বব্যবহৃত নাম এবং রবীন্দ্রনাথ ও অমূল্যধনের দেওয়া নাম সংখ্যানুক্রমে সাজিয়ে দেওয়া গেল। আশা করি তাতে পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন নামের মধ্যে সংগতি রক্ষা করে এই গ্রন্থের আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনুসরণ করা সহজ হবে।

দলবৃত্ত	= ১ স্বরবৃত্ত, লৌকিক (প্রবোধচন্দ্র)
(Syllabic)	২ বাংলা প্রাকৃত (রবীন্দ্রনাথ)
	৩ শ্বাসাঘাতপ্রধান (অমূল্যধন)
কলাবৃত্ত	= ১ মাত্রাবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)
(Moric)	২ সংস্কৃতভাঙা (রবীন্দ্রনাথ)
	৩ ধ্বনিপ্রধান (অমূল্যধন)
মিশ্রকলাবৃত্ত	= ১ অক্ষরবৃত্ত, যৌগিক (প্রবোধচন্দ্র)
(Mixed moric)	২ সাধু, পয়ারজাতীয় (রবীন্দ্রনাথ)
	৩ তানপ্রধান (অমূল্যধন)

গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে, বিশেষতঃ তৃতীয় অধ্যায়ে, এই পারিভাষিক নামগুলির বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে।

ছন্দপরিক্রমা

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছন্দের প্রাথমিক পরিচয়

অবতারণা

গদ্য পদ্য ও ছন্দস্পন্দ

সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নাম ছন্দ। আমাদের নিত্যকথিত বা পঠিত গদ্য ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিতরূপে বিন্যস্ত করলেই পদ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়। পদ্যছন্দও সংগীতের ন্যায় একটি ধ্বনিশিল্প। কিন্তু সংগীত মূলতঃ বাক্‌নির্ভর নয়। যন্ত্রসংগীতই তার প্রমাণ। উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীতও অনেকাংশেই বাক্‌নিরপেক্ষ। কিন্তু পদ্যছন্দ একান্তভাবেই বাক্‌নির্ভর। আমাদের নিত্যকথিত বা পঠিত ভাষার উচ্চারণ ও শ্রুতিই পদ্যছন্দের মূল আশ্রয়। সংগীতেরও ছন্দ আছে এবং পদ্যছন্দ ও গীতছন্দের সাদৃশ্যপার্থক্যের আলোচনাও ঔৎসুক্যজনক। এ সম্পর্কে প্রধান স্মরণীয় বিষয় এই যে, গীতছন্দ সর্বদাই বাক্যের গতিভঙ্গি তথা ভাবের অনুবর্তী না হতেও পারে। যেমন—

ঐ আসে | 'ঐ অতি' | ভৈরব | হরষে
'জলসিঞ্‌' | -'চিতক্ষিতি' | সৌরভ | রভসে।

—'কল্পনা', বর্ষামঙ্গল

এটা হচ্ছে গীতছন্দের ভঙ্গি। বলা বাহুল্য, এটা আমাদের বাক্‌ভঙ্গির অনুবর্তী নয়। অন্ততঃ তিন স্থলে বাক্‌ভঙ্গি লঙ্ঘিত হয়েছে। স্বাভাবিক বাক্‌বিন্যাসের ভঙ্গি হচ্ছে এরকম।—

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে।

বাক্‌বিন্যাস স্বভাবতঃই নির্ভর করে ভাষাগত ভাবের উপরে। সংগীতের পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়। পক্ষান্তরে বাক্‌বিন্যাস তথা ভাববিন্যাসের ভঙ্গিকে যথাসম্ভব রক্ষা করে চলাই পদ্যছন্দের নীতি।

আমাদের কথিত বা পঠিত গদ্যভাষার ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ তার গতি ও বিরতির দ্বারা। আমাদের মুখের ভাষা কখনও একটানা চলে না। মাঝে মাঝে থামে, আবার চলে। যেমন—

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই | তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে | ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, | সেখানেই শব্দগুচ্ছ | স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান | গদ্য আবৃত্তির মধ্যে | সুর লাগে, | অথচ তাকে | রাগিণী বলা চলে না, | তাতে তালমানসুরের | আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় | যেখানে রসের আবির্ভাব | সেখানে ছন্দ | অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, | কেবল তার মধ্যে থেকে যায় | ছন্দের গতিলীলা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ' (১৯৬২), গদ্যছন্দ, পৃ ১৫২

এই হচ্ছে গদ্যের স্বাভাবিক গতিভঙ্গি। ভাষার গতি যেখানে যেখানে থেমেছে, সেই স্থানগুলি নির্দিষ্ট হল বিরতিসূচক দণ্ডচিহ্নের দ্বারা। পাঠকের অভিরুচি অনুসারে এগুলির কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে, কিন্তু যথেচ্ছ বিরতি ঘটানো চলে না। মোট কথা গদ্যভাষারও একটা ভঙ্গি আছে, সে ভঙ্গি দেখা দেয় তার ভাবগত গতি ও বিরতির ফলে। আর তারই প্রভাবে 'শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত' হয়ে ওঠে। এই যে গতি ও বিরতির স্বতঃসজ্জিত শব্দগুচ্ছ, তাকেই বলি 'বাক্‌পর্ব'। প্রত্যেক বাক্‌পর্বের প্রথমেই থাকে একটি করে ঝোঁকের বেগ, আর ওই বেগজাত গতির বিরতি ঘটে বাক্‌পর্বের শেষে। এই বেগ ও বিরতি ভাষাকে তরঙ্গিত করে তোলে। ভাষার এই তরঙ্গিত ভঙ্গিকেই বলি ছন্দ।

গদ্য ও পদ্যের ছন্দ একরূপ নয়। গদ্যভাষার ছন্দ কখনও 'অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না'। এই অনতিনির্দিষ্ট বা অনতিনিরূপিত[১] গদ্যছন্দকে বলতে পারি 'বাক্‌ছন্দ' (speech rhythm)। বেগ- ও বিরতি-জাত এই যে উত্থানপতনময় তরঙ্গভঙ্গি, তারই সাধারণ নাম 'ছন্দস্পন্দ' (rhythm)। এই ছন্দস্পন্দ গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষাতেই আছে। পদ্যের ছন্দস্পন্দ সুনির্দিষ্ট বা সুনিরূপিত, কেননা তার পর্বগুলি সুপরিমিত (measured)। গদ্যের ছন্দস্পন্দ অনির্দিষ্ট বা অনিরূপিত, কেননা তার পর্বগুলি অপরিমিত (unmeasured)।

১ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের (১৯৩২) ভূমিকা অথবা 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৬২), পৃ ১৮৭।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়,—গদ্যের গতিকে যথার্থ ছন্দ বলা চলে না, কারণ তাতে সুপরিমিত পর্ব থাকে না, তার 'আভাসমাত্র' থাকে। সুপরিমিত ছন্দপর্বের এই আভাসটুকুকেই তিনি বলেছেন 'ছন্দের গতিলীলা'। গদ্যের গতিতে যথার্থ ছন্দ থাকে না, থাকে তার লীলাটুকু মাত্র। ছন্দ-আলোচনায় যার পারিভাষিক নাম ছন্দস্পন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'ছন্দের গতিলীলা'।

প্রস্বর ও যতি

গদ্য ও পদ্যের প্রধানতম পার্থক্য এই যে, গদ্যস্পন্দ (prose rhythm) উৎপন্ন হয় অপরিমিত পর্বযোগে আর পদ্যস্পন্দ (verse rhythm) উৎপন্ন হয় সুপরিমিত পর্বযোগে। পদ্যরচনার পর্ব কিভাবে পরিমিত হয় তা নির্ণয় করাই ছন্দশাস্ত্রের প্রাথমিক কাজ। এই কাজের জন্য প্রথম প্রয়োজন পদ্যরচনার পর্ববিভাগ করা। পূর্বেই বলা হয়েছে, পর্বের প্রথমেই থাকে একটি করে ঝোঁক, আর তার শেষে থাকে বিরতি; এই বিরতির দ্বারা ঝোঁকের বেগের অবসান সূচিত হয়। এই ঝোঁকের পারিভাষিক নাম **প্রস্বর** (accent), আর ছন্দের পরিভাষায় পর্বগতির অবসানসূচক বিরতিকে বলা হয় **যতি** (pause)। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

ˈনৃত্যের বশে | ˈসুন্দর হল | ˈবিদ্রোহী পর | ˈ-মাণু,
ˈপদযুগ ঘিরে | ˈজ্যোতিমঞ্জীরে | ˈবাজিল চন্দ্র | ˈ-ভানু।

—'নটরাজ', নৃত্য

প্রতি পর্বের আদ্যক্ষরের শীর্ষস্থ দণ্ডরেখাটি প্রস্বরসূচক, আর প্রতি পর্বের পার্শ্বস্থ দণ্ডচিহ্নটি যতিসূচক। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক লাইনের শেষেও একটি করে যতি আছে, যদিও তা কোনো চিহ্নযোগে নির্দিষ্ট হয় নি।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক লাইনেই চারটি করে যতি আছে। একটু মন দিয়ে শুনলেই টের পাওয়া যাবে যে, ওই সবগুলি যতি সমান পর্যায়ের নয়— ওগুলির মধ্যে তারতম্য আছে। প্রত্যেক লাইনের প্রথম ও তৃতীয় যতি-দুটি স্পষ্ট অনুভূত হলেও অন্য দুটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত লঘু। দ্বিতীয় যতিটি এই দুটির তুলনায় স্পষ্টতর, অর্থাৎ এটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। আর শেষ যতিটি স্পষ্টতম, এটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। ছন্দের পরিভাষায় প্রথম ও তৃতীয়, এই

দুটি যতিকে বলা যায় **লঘুযতি**, আর চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যতিটিকে বলা যায় **পূর্ণযতি**। দ্বিতীয় যতিটির গুরুত্ব এই দুইএর মধ্যবর্তী, অতএব এটিকে বলা যায় **অর্ধযতি**। এই তিন রকম যতির পার্থক্য দেখাবার জন্য তিন রকম যতি-চিহ্নের প্রয়োজন। যেমন—

যাহারা তোমার | বিষাইছে বায়ু, ‖ নিভাইছে তব | আলো, I
তুমি কি তাদের | ক্ষমা করিয়াছ, ‖ তুমি কি বেসেছ | ভালো ?I

—'পরিশেষ', প্রশ্ন

প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে লঘুযতি, দ্বিতীয় পর্বের পরে অর্ধযতি আর সর্বশেষে পূর্ণযতি। সব সময় পূর্ণযতি-সূচক কোনো চিহ্ন না দিলেও চলে, অর্থাৎ উহ্য রাখা চলে। তেমনি প্রস্বরচিহ্নও উহ্য রাখা চলে। এ স্থলে তাই রাখা হয়েছে।

পংক্তি, পদ ও পর্ব

বিভিন্ন রকম যতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগগুলির বিভিন্ন নাম থাকাও প্রয়োজন। তাই পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগকে বলব পংক্তি। অর্থাৎ ছন্দের পূর্ণযতিবিভাগের পারিভাষিক নাম **পংক্তি** (verse)। তেমনি অর্ধযতিনির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগের নাম **পদ** (clause) আর লঘুযতি বিভাগের নাম **পর্ব** (foot)।

এই ছন্দোবিভাগ অনুসারে পূর্ণযতিকে **পংক্তিযতি**, অর্ধযতিকে **পদযতি** এবং লঘুযতিকে **পর্বযতি** নামেও অভিহিত করা যায়।

উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে আছে দুই পদ ; আর প্রতি পদে আছে দুই পর্ব। অর্থাৎ এই দুই দৃষ্টান্তেরই প্রত্যেক পংক্তি দ্বিপদী ও প্রত্যেক পদ দ্বিপর্বিক। উভয়ত্রই পংক্তির শেষ পর্বগুলি স্পষ্টতঃই অপূর্ণ। বাংলা ছন্দে অধিকাংশ স্থলেই পংক্তির শেষপ্রান্তস্থিত পর্ব অপূর্ণ থাকে।

এবার অন্যরকম একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

জন্মেছি যে | মর্ত্যকোলে ‖ ঘৃণা করি | তারে
ছুটিব না | স্বর্গ আর ‖ মুক্তি খুঁজি | -বারে।

—'সোনার তরী', আত্মসমর্পণ

এই দৃষ্টান্তেও প্রতি পংক্তি দ্বিপদী, প্রতি পদ দ্বিপর্বিক এবং শেষ পর্ব অপূর্ণ। কিন্তু কানের সাক্ষ্যেই বোঝা যায়, পংক্তি পদ ও পর্বের এই বর্ণনার অভিন্নতা

সত্ত্বেও এই দৃষ্টান্তটি আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক্ থেকেই পূর্ববর্তী দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বহুলাংশেই পৃথক্। যথাস্থানে এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করা যাবে।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, ছন্দের পংক্তি (metrical line বা verse) আর মুদ্রিত বা লিখিত ছত্র (printed বা written line) এক নয়। একই ছন্দপংক্তিকে অভিরুচি বা প্রয়োজনমতো একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা যায় বা লিখতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে পংক্তিগুলিকে সাধারণতঃ অর্ধযতিতে বিভক্ত করে দুই বা ততোধিক ছত্রে সাজানো হয়। কখনও কখনও লঘুযতি অনুসারেও ছত্রভাগ করা যায়। কিন্তু যথেচ্ছ ভাগ করা কখনও চলে না।

অর্ধযতি বা পদযতি (medial pause, caesural pause) অনুসারে পংক্তিখণ্ডনের দৃষ্টান্ত এই।—

লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে ‖
দ্বিপদীর শ্লোক—
আকাশ প্রথম পদে ‖
লিখিল আলোক ;
ধরণী শ্যামল পত্রে ‖
বুলাইল তুলি
লিখিল আলোর মিল ‖
নির্মল শিউলি।

—'স্ফুলিঙ্গ' (১৩৬৭), ২২৩

এই রচনাটিতে আছে মোট চার পংক্তি ; প্রত্যেক পংক্তি দ্বিপদী এবং পদযতি অনুসারে বিভক্ত হয়ে দুই ছত্রে সজ্জিত। বলা বাহুল্য, পংক্তিগুলিকে ভেঙে দুই ছত্রে না সাজিয়ে অনায়াসেই এক ছত্রেও সাজানো যায়। আর-একটা দৃষ্টান্ত—

মুদিত আলোর | কমলকলিকা | -টিরে ‖
রেখেছে সন্ধ্যা | আঁধার পর্ন | -পুটে।
উতরিবে যবে | নবপ্রভাতের | তীরে
তরুণ কমল | আপনি উঠিবে | ফুটে।

উদয়াচলের | সে তীর্থপথে | আমি ‖
চলেছি একেলা | সন্ধ্যার অনু | -গামী, ‖
দিনান্ত মোর | দিগন্তে পড়ে | লুটে ॥

—'গীতালি,' ১০৭

এই দৃষ্টান্তটিতে আছে মোট তিন পংক্তি, পদে পদে ভেঙে সাত ছত্রে সাজানো। প্রথম দুই পংক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পংক্তি ত্রিপদী ; প্রত্যেক পদে তিন পর্ব, শেষ পর্ব অপূর্ণ।

পর্বে পর্বে বিভাজনের দৃষ্টান্ত এই।—

বুকভরা মধু | বঙ্গের বধূ ‖ জল লয়ে যায় | ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ | করে আনচান ‖ চোখে আসে জল | ভরে।

—'চিত্রা', দুই বিঘা জমি

এই দৃষ্টান্তের দ্বিপদী পংক্তিগুলিকে পর্বে পর্বে ভেঙে তিন বা চার ছত্রেও লেখা যায়। যেমন—

বুকভরা মধু
বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় | ঘরে।

শেষ অপূর্ণ পর্বটিকে ('ঘরে') বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চার লাইনও করা যেতে পারে। অনেক সময় পংক্তি ভাঙার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় পর্বপ্রান্তিক (বা পদপ্রান্তিক) মিলকে ফুটিয়ে তোলা। উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রথম দুই পর্বের পরেই মিল আছে, তৃতীয় পর্বের পরে নেই। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ (অপূর্ণ) পর্বকে এক লাইনেই রাখা হয়েছে। এ রকম রচনাকে অনেক সময় দুই লাইনেও সাজানো হয়। যেমন—

বুকভরা মধু   বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় ঘরে।

মিল দেখাবার প্রয়োজনে প্রথম লাইনে দুই পর্বের মধ্যে একটু ফাঁক রাখা হয়।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, প্রচলিত প্রথায় এইজাতীয় রচনাকে বলা হয় 'ত্রিপদী'। বস্তুতঃ এসব রচনাকে ত্রিপদী বলা সমীচীন নয়। কেননা, 'বুকভরা

মধু'-র ন্যায় লঘুযতির বিভাগকে 'পদ' বলার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। পর্বে-পর্বে মিল থাকলেই তাকে 'পদ' বলা যায় না। যেমন—

শলাকাবিদ্ধ | হতেছে সিদ্ধ || মন্ত্রনিষিদ্ধ | পক্ষী।
—'কল্পনা', উন্নতিলক্ষণ

নৌকা ফি সন | ডুবিছে ভীষণ || রেলে কলিশন | হয়।
—দ্বিজেন্দ্রলাল, 'হাসির গান'

এসব স্থলে তিন পর্বে মিল আছে বলেই এ ধরনের পংক্তিকে চৌপদী বলা চলে না। অর্ধযতির প্রতি দৃষ্টি রেখে দ্বিপদী বলাই সমীচীন। পক্ষান্তরে

চন্দ্র যখন | অস্তে নামিল || তখনো রয়েছে | রাতি,
পূর্বদিকের | অলস নয়নে || মেলিছে রক্ত | ভাতি।
—'চিত্রা', সিন্ধুপারে

এটার কোনো পর্বের পরেই মিল নেই, অথচ গঠনপ্রণালীতে এটা পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং এটিকেও দ্বিপদী বলাই সমীচীন। আর যদি লাইন ভাঙার প্রয়োজন হয় তবে অর্ধযতিতে বিভক্ত করে দুই লাইনে সাজানো যেতে পারে।

পূর্বে বলেছি পর্বান্তিক বা পদান্তিক মিলকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে ছন্দপংক্তিকে অনেক সময় ভেঙে ভেঙে সাজাতে হয়। তার আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দুঃখের | বরষায় ||
চক্ষের | জল যেই ||
নাম্‌ল,
বক্ষের | দরজায় ||
বন্ধুর | রথ সেই ||
থাম্‌ল।
—'গীতালি',১

এর পংক্তিগুলি ত্রিপদী, পদে পদে ভাঙা হয়েছে। এর পর্যায়ক্রমিক মিলগুলি লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, মিল দেখাবার প্রয়োজন না থাকলেও লেখকের অভিরুচিক্রমে পদে-পদে পংক্তি ভাঙা চলে।

পূর্বে বলা হয়েছে, পর্বের আদিতে থাকে একটি প্রস্বর ও অন্তে থাকে একটি লঘুযতি। এই প্রস্বর ও যতির যোগেই ছন্দ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ ছন্দস্পন্দ উৎপন্ন হয়। পর্বের আদি ও অন্তস্থিত প্রস্বর ও যতির যোগে যে উত্থানপতনময় তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে বলতে পারি 'পর্বতরঙ্গ' বা 'পর্বস্পন্দ' (foot rhythm) এই পর্বস্পন্দের দ্বারাই সমগ্র পংক্তির স্পন্দবৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বস্পন্দের পরিচয়েই রচনার ছন্দস্পন্দের পরিচয়। বস্তুতঃ রচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রধানতঃ নির্ভর করে তার পর্বগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির উপরে। পর্বপ্রকৃতির কথা যথাস্থানে পরে বলা যাবে।

যতিলোপ

এস্থলে পর্বের আকৃতি সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। পর্বের আকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মুখ্যতঃ তার অন্তস্থিত যতির দ্বারা এবং গৌণতঃ তার আদিস্থিত প্রস্বরের দ্বারা। বাংলা ছন্দের পর্বগত এই যতি ও প্রস্বর বাঙালির কানে স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়ে। তাই পর্ববিভাজনের পক্ষেও কোনো বাধা ঘটে না। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্বান্তিক যতি ও তার পরবর্তী পর্বের আদিস্থিত প্রস্বরের লোপ ঘটে। সেসব স্থলে কিছু সংশয় দেখা দেয়। যেমন—

দুর্লভ এ | ধরণীর ‖ লেশতম | স্থান,
দুর্লভ এ | জগতের ‖ ব্যর্থতম | প্রাণ।
—'চৈতালি', দুর্লভ জন্ম

চঞ্চল | মৌমাছি ‖ গুঞ্জরি | গায়,
বেণুবনে | মর্মরে ‖ দক্ষিণ | বায়।
—'চিত্রবিচিত্র', ফাল্গুন

এই দুটি রচনা প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও আকৃতিতে অভিন্ন : দুটিরই পর্বগত যতি নির্ণয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ফলে প্রস্বর নির্ণয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই ; চিহ্নযোগে দেখানো হয়নি, উহ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত দুটি দৃষ্টান্তেই পর্বযতি স্থাপনে সংশয় দেখা দেয়।—

লজ্জা দিয়ে | সজ্জা দিয়ে ‖ দিয়ে আব | -রণ,
তোমারে দুর্ ⁝ লভ করি ‖ করেছে গো ⁝ পন।

পড়েছে তো : মার পরে ‖ প্রদীপ্ত বা : সনা,
অর্ধেক মা : নবী তুমি ‖ অর্ধেক কল্ : পনা।
—'চৈতালি', মানসী

ধীরে ধীরে | শর্বরী ‖ হয় অব | -সান,
উঠিল বি : হঙ্গের ‖ প্রত্যুষ | -গান।
বনচূড়া | রঞ্জিল ‖ স্বর্ণলে : খায়
পূর্বদি : গন্তের ‖ প্রান্তরে : খায়।
—'চিত্রবিচিত্র', উৎসব

এই দুটি দৃষ্টান্তও আকৃতি ও প্রকৃতিতে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তদুটির অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, কবির প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে পর্বযতি লোপ করা হয়েছে—সেসব ত্রিবিন্দু দণ্ডচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট। যেসব স্থলে এরূপ পর্বযতির লোপ ঘটেছে, সেসব স্থলে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রক্ষার প্রয়োজনে আমাদের রসনা পর্বযতির স্বাভাবিক অবস্থানকে লঙ্ঘন করে স্বতঃই একটানা অগ্রসর হয়ে চলে। ধ্বনির এই অবিচ্ছিন্ন গতির ফলে ছন্দতরঙ্গের একঘেয়েমি দূর হয়ে একটু অভিনবত্বও দেখা দেয়। কবির ভাবপ্রকাশের সুযোগও প্রশস্ততর হয়। মনে রাখা দরকার যে, এই লঘুযতি বা পর্বযতি লোপের ফলে তার পরবর্তী পর্বপ্রস্বরটিও লুপ্ত হয়, আর ওই লুপ্ত যতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বদুটি একত্র সংলগ্ন হয়ে গিয়ে একটি 'যুক্তপর্বিক পদ' উৎপন্ন হয়। উপরের দৃষ্টান্তদুটির 'পড়েছে তোমার 'পরে', 'উঠিল বিহঙ্গের' প্রভৃতি অংশকে বলা যায় 'যুক্তপর্বিক' পূর্ণপদ' আর 'প্রদীপ্ত বাসনা', 'স্বর্ণলেখায়' প্রভৃতি অংশকে বলা যায় যুক্তপর্বিক অপূর্ণপদ। 'পড়েছে তোমার 'পরে', 'প্রদীপ্ত বাসনা' প্রভৃতি অংশকে পূর্ণ বা অপূর্ণ 'পর্ব' বলে গণ্য না করাই সমীচীন মনে করি।

বলা প্রয়োজন যে, সব রকমের ছন্দেই পর্বযতির লোপ ঘটানো হয় না। ওরকম লোপের ফলে ছন্দে গতিবৈচিত্র্য উৎপন্ন না হয়ে অনেক সময় তালভঙ্গ ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়। যেমন—

একদা তুমি | অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব | ভুবনে,
মরি মরি অ : নঙ্গদেব | -তা।

কুসুমরথে | মকরকেতু | উড়িত মধু | -পবনে,
পথিকবধূ | চরণে প্রণ | -তা।

—'কল্পনা', মদনভস্মের পূর্বে

দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পর্বযতিলোপের ফলে আবৃত্তির সময়ে একটু খটকা লাগে। তাই এইজাতীয় পর্বযতিলোপের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির শেষে পর্বযতি-দুটিকেও লুপ্ত করা যায় অর্থাৎ 'দেবতা' ও 'প্রণতা' এই শব্দ দুটিকে অবিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারণ করা যায়। তাতে বিশেষ খটকা লাগে না, আর উচ্চারণের স্বাভাবিকতাও বজায় থাকে। কিন্তু এরকম যতিলোপের দৃষ্টান্তও বেশি পাওয়া যায় না।

অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্তও বিরল। অর্ধযতি পদবিভাগের সূচক। অর্ধযতি লুপ্ত হলে পদবিভাগও লোপ পায়। সেটা পদ্যরচনার পক্ষে মারাত্মক। কেননা, পদবদ্ধ রচনার নামই পদ্য। তথাপি পদযতিলোপের দৃষ্টান্তও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যেমন—

নিজ হস্তে | নির্দয় আ : ঘাত করি, | পিতঃ,
ভারতেরে | সেই স্বর্গে ‖ কর জাগ | -রিত।

—'নৈবেদ্য', ৭২

বীর্য দেহ | তোমার চ ⁝ রণে পাতি' | শির
অহর্নিশি | আপনারে ‖ রাখিবারে | স্থির।

—'নৈবেদ্য', ৯৯

এরকম অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে বিরল। প্রাচীন সাহিত্যে এত বিরল নয়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও এজাতীয় দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। এস্থলে ও বিষয়ের অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দলবিভাজন

পূর্বে বলা হয়েছে, পর্বের আকৃতি ও প্রকৃতির দ্বারাই রচনাবিশেষের ছন্দোবৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বের আকৃতি ও প্রকৃতি নিরূপণ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পর্বের উপাদান নিরূপণ করা। বলা বাহুল্য, ছন্দের পর্ব গঠিত হয় এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে, আর শব্দ গঠিত হয় এক বা একাধিক

সিলেব্‌ল্ নিয়ে। শব্দের যে অংশ আমাদের বাক্‌যন্ত্রের এক-এক প্রয়াসে স্বতঃ-উচ্চারিত হয় তাকেই বলা হয় সিলেব্‌ল্। সিলেব্‌ল্-এর বাংলা পারিভাষিক নাম **দল**। যেমন—'দল্', 'ছন্.দ', 'ছান্.দ'.' সিক্', এই তিনটি শব্দে দল আছে যথাক্রমে একটি, দুটি ও তিনটি। তাই এই শব্দগুলিকে যথাক্রমে একদল (monosyllabic), দ্বিদল (dissyllabic) ও ত্রিদল (trisyllabic) বলে বর্ণনা করা যায়।

এই দলও আবার দুই রকম। কতকগুলি দলের পরে এক বা একাধিক আশ্রিত স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে। যেমন—যাই্, যায়্ (=যাএ্), যাও্, যাক্, যাস্, দিন্, প্রান্.তর্, সং.গীত্, সিল্‌ক্। এরকম আশ্রিতান্ত দলকে বলি **রুদ্ধদল** (closed syllable), রুদ্ধদলের স্বাতন্ত্র্যহীন অংশকে বলি 'আশ্রিত বর্ণ,' আর তার নিম্নস্থ, চিহ্নকে বলি 'আশ্রয়চিহ্ন'—কেননা আশ্রিত স্বরবর্ণের নিম্নস্থ চিহ্নকে হস্‌চিহ্ন বলা চলে না। যে দলের উভয়াংশই স্বরবর্ণ তাকে বলা যায় 'রুদ্ধস্বর' (closed vowel)। যেমন—ঐ (=অই্), ঔ (=অউ্), আই্ (নাই), আউ্ (ঝাউ), অও্ (লও), আও্ (যাও), অয়্ (=অএ্, লয়), আয়্ (=আএ্. যায়)। বলা বাহুল্য, রুদ্ধস্বরও রুদ্ধদল বলেই স্বীকার্য। যে দলের শেষে আশ্রিত বর্ণ থাকে না তাকে বলি **মুক্তদল** (open syllable)। যেমন—না, সে, খু.কু ; •ক.বি.তা ; ম.নী.ষী ; বা.তা.সা। আর আশ্রিতান্তহীন স্বরবর্ণকে বলি 'মুক্তস্বর' (open vowel)। যেমন—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও।

দলের উচ্চারণভেদ

দলের উচ্চারণভেদের উপরে পর্বের তথা ছন্দের প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাংলায় স্বরবর্ণের সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘভেদ নেই। অর্থাৎ বাংলায় নিত্যহ্রস্ব ও নিত্যদীর্ঘ স্বরবর্ণ নেই। কিন্তু বাংলা উচ্চারণেও হ্রস্বদীর্ঘতা আছে। বাংলায় ছন্দের আলোচনায় শুধু স্বরবর্ণ নয়, সমগ্র দলকেই হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলে গণ্য করা সমীচীন মনে করি।

বাংলায় মুক্তদল সাধারণতঃ হ্রস্ব বা লঘু বলেই গণ্য হয়। তবে কোনো মুক্তদল যদি কখনও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বর্ণের সহিত সংলগ্ন না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় তবে তা স্বভাবতঃই দীর্ঘত্ব লাভ করে। যেমন—

জাগিয়া উঠি | শয্যাতলে | শুধাল রাজ | -বালা—
'কে- পরালে | মালা !' |

—'সোনার তরী', স্বপ্নোত্থিতা

দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
'কে- তুমি ?'
পেল না উত্তর।

—'শেষ লেখা', ১৩

একটু মন দিলেই বোঝা যাবে, এই দুই স্থলেই 'কে' এই একদল শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়েছে এবং দীর্ঘত্বও পেয়েছে।

আর-একটা দৃষ্টান্ত এই।—

যদি খোকা না- | হয়ে
আমি হতেম কুকুর | -ছানা,—
তবে পাছে তোমার | পাতে
আমি মুখ দিতে যাই | ভাতে
তুমি করতে আমায় | মানা ?

—'শিশু', সমব্যথী

এখানে 'না' এই একদল শব্দটি আমাদের উচ্চারণে স্পষ্টতঃই দীর্ঘত্ব পেয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, মুক্তদলের উক্ত দীর্ঘতা ঘটে ধ্বনির প্রসারণের দ্বারা। মুক্তদলের এরকম প্রসারণের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল এবং যদৃচ্ছাক্রমে এরকম প্রসারণ ঘটানো যায় না। পক্ষান্তরে রুদ্ধদলের প্রসারণ অতি সহজেই ঘটানো যায়। আর রুদ্ধদলের প্রসারণের উপরেই বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য বহুলাংশে নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'চুড়ি চা-ই | চুড়ি চাই' সে | হাঁকে,
চীনের পুতুল | ঝুড়িতে তার | থাকে।

—'শিশু', বিচিত্র সাধ

সব বাঙালির কানেই দ্বিতীয় 'চাই'এর তুলনায় প্রথম 'চাই'এর প্রসারণ বা দীর্ঘতা অনায়াসেই ধরা পড়বে। আরও দৃষ্টান্ত দিই।—

আজকে এমন | বিজন প্রাতে ‖ আর কারে কি | চাই ?
সে কহিল, | ভাই,
না-ই, না-ই | নাই গো আমার ‖ কারেও কাজ | নাই।
—'ক্ষণিকা' কূলে

তৃতীয় 'নাই'এর সঙ্গে তুলনা করলে প্রথম দুই 'নাই'এর প্রসারণ সকলের কানেই ধরা পড়বে।

'সারিয়ে দেবে | বলেছিলে, ‖ দাও এঁটে ইস্ | -ক্রুপ'।
অমি বললে | কানে কানে, ‖ 'চু-প চু-প | চুপ'।
—'পরিশেষ', নূতন শ্রোতা

দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় পর্বের দুটি 'চুপ' শব্দের প্রসারণ লক্ষণীয়।

অতএব দেখা গেল, বাঙালির রসনা অতি অনায়াসেই রুদ্ধদলের প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে। রুদ্ধদলের এই সহজ প্রসারণপ্রবণতাকে বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির ব্যাপারে নানাভাবেই কাজে লাগানো হয়ে থাকে। যথাস্থানে তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া যাবে।

মাত্রানিরূপণ

পূর্বেই বলেছি পর্বের পরিচয়েই ছন্দের পরিচয়। আর, পরিমিত ধ্বনিবিন্যাসের নামই ছন্দ। সুতরাং ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পর্বের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় করা। আর পর্ব হচ্ছে কতকগুলি দলের সমষ্টি। কাজেই বিভিন্ন দলের আয়তন জানা গেলেই পর্বের আয়তন সহজেই নির্ণয় করা যায়।

যার সাহায্যে কোনো কিছুর আয়তন মাপা যায় সেই পরিমাপক এককের পারিভাষিক নাম মাত্রা (unit of measure)। বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণ নির্ণীত হয় বিভিন্ন মাত্রার সাহায্যে। বাংলায় ছন্দপর্ব পরিমিত হয় দুই রকম মাত্রার সাহায্যে। এক শ্রেণীর ছন্দে এক-একটি দলই (মুক্ত বা রুদ্ধ) এক মাত্রা বলে

স্বীকৃত হয়ে থাকে। এরকম মাত্রাকে বলা যায় **দলমাত্রা** (syllabic unit)। আর-এক শ্রেণীর ছন্দে প্রসারিত দল অপ্রসারিত দলের দ্বিগুণ বলে (অর্থাৎ দুইটি অপ্রসারিত দলের সমান বলে) স্বীকৃত হয়ে থাকে। কবিতা আবৃত্তির কালে একটি অপ্রসারিত দলের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে বলি **কলা** (mora)। সুতরাং অপ্রসারিত দলকে এক কলা এবং প্রসারিত দলকে দুই কলা বলে গণনা করলেই এই শ্রেণীর ছন্দপর্বের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণীত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দে এক কলাই এক মাত্রা বলে স্বীকৃত। সুতরাং এরকম মাত্রাকে বলতে পারি **কলামাত্রা** (moric unit)।

ছন্দোরীতি ও ছন্দের প্রকৃতি

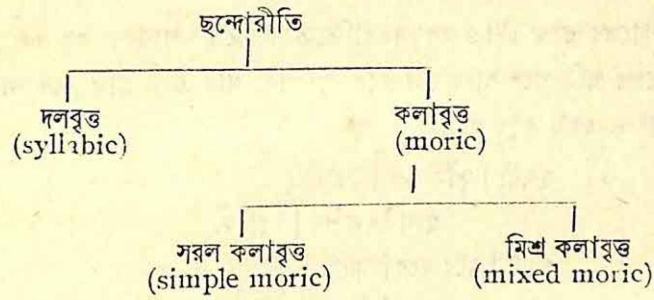
বিভিন্ন রকমের ছন্দে মাত্রা বিন্যস্ত হয় বিভিন্ন রীতিতে। ছন্দের প্রকৃতি তথা শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে এই মাত্রাবিন্যাসরীতির উপরেই।

এক শ্রেণীর ছন্দে পর্ব গঠিত হয় দলমাত্রার যোগে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দপর্ব গঠনের কাজে প্রত্যেক দলকে এক-এক মাত্রা বলে স্বীকার করে নেওয়াই প্রচলিত রীতি। মাত্রাবিন্যাসের এই রীতিকে বলতে পারি **দলমাত্রিক** রীতি, এরই নামান্তর **দলবৃত্ত** (syllabic)। সংক্ষেপে বলা যায়, যে রীতিতে দলমাত্রাই ছন্দপর্ব গঠনের উপাদান রূপে স্বীকৃত তারই নাম দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত রীতি। তেমনি যে রীতিতে কলামাত্রা নিয়ে ছন্দপর্ব গঠিত হয় তাকে বলা যায় **কলামাত্রিক** বা **কলাবৃত্ত** (moric) রীতি।

কলাবৃত্ত রীতির দুই রূপ। এক রূপের কলাবৃত্ত রীতিতে সব রুদ্ধদলই প্রসারিত হয়, ফলে এই রীতির ছন্দে প্রতি মুক্তদলে এক কলা ও প্রতি রুদ্ধদলে দুই কলা গণনা করলেই পর্বের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণীত হয়। এই রীতিই হচ্ছে যথার্থ কলামাত্রিক বা কলাবৃত্ত রীতি। আর-এক রকম কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে ধ্বনিবিন্যাসের কিছু বিশিষ্টতা দেখা যায়। তাতে প্রত্যেক মুক্তদল এক কলা বলে গণ্য হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক রুদ্ধদল দুই কলার মূল্য পায় না। এই রীতিতে স্থানবিশেষে রুদ্ধদলের প্রসারণ ঘটে, অন্যত্র তা ঘটে না। ফলে এই রীতির ছন্দে রুদ্ধদল স্থানবিশেষে দুই কলা ও অন্যত্র এক কলা বলে গণ্য হয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই রীতিকে 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক' বা 'বিশিষ্ট কলাবৃত্ত' (special moric) রীতি বলে অভিহিত করা যায়। রুদ্ধদলের দুই

রকম রূপের যোগে গঠিত বলে একে 'মিশ্র কলামাত্রিক' বা 'মিশ্র কলাবৃত্ত' (mixed moric) নামও দেওয়া যায়।

ছন্দপর্বের মাত্রাবিন্যাসরীতিই 'ছন্দোরীতি' বলে পরিচিত। এই ত্রিবিধ ছন্দোরীতিকে বংশলতিকারূপে সাজিয়ে দেওয়া গেল। আশা করি তাতে বিষয়টা বোঝবার ও মনে রাখবার সহায়তা হবে।—



এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই তিন রীতির যথার্থ স্বরূপ ও তাদের পারস্পরিক পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করছি।—

১। কেউ বা তোমায় | ভালোবাসে, ‖
কেউ বা বাসতে | পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে | আছে, কেউ বা ‖
সিকি পয়সা | ধারে না যে,
কতকটা সে | স্বভাব তাদের ‖
কতকটা বা | তোমারও ভাই,
কতকটা এ | ভবের গতিক, ‖
সবার তরে | নহে সবাই।

—'ক্ষণিকা', বোঝাপড়া

গণনা করলেই দেখা যাবে, এর প্রত্যেক পর্বেই আছে চারটি করে দল। অর্থাৎ দলসংখ্যার এই সমতার দ্বারাই রচনাটির সৌষম্য রক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং নিঃসন্দেহেই বলা যায়, এখানে দলবৃত্ত রীতি অনুসৃত হয়েছে।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

২। ত্রিভুবনের | গোপন কথা | -খানি ||
কে জাগিয়ে | তুলবে তাহার | মনে,
আমি যদি | আমার মুক্তি | লয়ে
যুক্তি করি | আপন গৃহ | -কোণে ?

—'ক্ষণিকা', কবির বয়স

পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের ন্যায় এটাও দলবৃত্ত রীতিতে রচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পদে আছে দুটি করে পূর্ণ পর্ব, আর এটির প্রতি পদে আছে দুটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব।

৩। সুন্দরী | তুমি শুক | -তারা ||
সুদূর শৈলশিখ | -রান্তে,
শর্বরী | যবে হবে | সারা ||
দর্শন | দিয়ো দিগ্ | -ভ্রান্তে।
ধরা যেথা | অম্বরে | মেশে ||
আমি আধো | -জাগ্রত | চন্দ্র,
আঁধারের | বক্ষের | 'পরে ||
আধেক আলোকরেখা | -রন্ধ্র।

—'মহুয়া', শুকতারা

এর যতিগুলির প্রতি একটু মন দিলেই বোঝা যাবে, এর প্রত্যেক পংক্তি দ্বিপদী, প্রতি পদে তিন পর্ব ও তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। আরও বোঝা যাবে যে, প্রথম ও চতুর্থ পংক্তির দ্বিতীয় পদের প্রথম লঘু বা পর্ব-যতিটি লুপ্ত। আর, আবৃত্তিকালে এর দলগুলির উচ্চারণের প্রতি একটু নজর রাখলে অনায়াসেই ধরা পড়বে যে, এর প্রত্যেকটি রুদ্ধদলই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত। তদনুসারে হিসাব করলে বোঝা যাবে, এটির প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে চারকলা, আর প্রতি পংক্তির প্রথম পদের শেষ অর্থাৎ তৃতীয় (অপূর্ণ) পর্বে দুই কলা ও দ্বিতীয় পদের শেষ পর্বে তিন কলা। বোঝা গেল, এই অংশের ধ্বনিসামঞ্জস্য নির্ভর করছে এর পর্বগুলির কলাবিন্যাসসমতার উপরে। সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ছন্দ রচিত হয়েছে সরল কলামাত্রিক বা কলাবৃত্ত রীতিতে।

৪। আজি মো-র | দ্রাক্ষাকুঞ্জ | -বনে ‖
গুচ্ছ গুচ্ছ | ধরিয়াছে | ফ-ল।···
বসন্তে-র | দুরন্ত বা : তাসে ‖
নুয়ে বুঝি | নামিবে ভূ : ত-ল।

—'চৈতালি', উৎসর্গ

৫। ব্রহ্ম হতে | কী-ট পর | -মাণু, ‖
সর্বভূতে | সে-ই প্রেম | -ম-য়;
ম-ন প্রা-ণ | শরী-র অর্ : প-ণ ‖
কর সখে | এ সবা-র | পা-য়।
বহুরূপে | সম্মুখে তো : মা-র, ‖
ছাড়ি কোথা | খুঁজিছ ঈশ্ : শ্ব-র ?
জীবে প্রে-ম | করে যে-ই | জ-ন ‖
সে-ই জ-ন | সেবিছে ঈশ্ : শ্ব-র।

—বিবেকানন্দ, 'বীরবাণী', সখার প্রতি

পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের মতো এ দুটিও দ্বিপদী, প্রতি পদে তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। কিন্তু এ দুটির মাত্রাসমাবেশপ্রণালী পৃথক্। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, শব্দপ্রান্তিক সবগুলি রুদ্ধদলই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত, আর অন্য রুদ্ধদলগুলি অপ্রসারিত এ এককলা-পরিমিত। অতএব এই অংশটি মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত। এর প্রতি পূর্ণপর্বে চার ও অপূর্ণ পর্বে দুই মাত্রা। অর্থাৎ এর প্রতি পদের মাত্রাবিন্যাস যথাক্রমে চার-চার-দুই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্ত আকৃতিতে অর্থাৎ বাহ্য গঠনে একই রকম, কিন্তু কানের রুচিতে তিনটি তিন রকম লাগে। শ্রুতি-রুচির এই ভিন্নতাই ছন্দপ্রকৃতির পরিচায়ক। শ্রুতিরুচি তথা ছন্দপ্রকৃতির এই পার্থক্যের হেতু দৃষ্টান্তগুলির মাত্রাবিন্যাসরীতির অর্থাৎ ছন্দোরীতির ভিন্নতা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, চতুর্থ ও পঞ্চম দৃষ্টান্ত-দুটি আকৃতি ও প্রকৃতি দুই দিক্ থেকেই সম্পূর্ণ এক রকম।

ছন্দোবন্ধ ও ছন্দের আকৃতি

ছন্দের প্রকৃতি নিরূপিত হয় মাত্রাগণনারীতি বা ছন্দোরীতির দ্বারা। তেমনি ছন্দের আকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দের ধ্বনিসমাবেশপ্রণালীর দ্বারা। এই ধ্বনিসমাবেশেরই নামান্তর 'ছন্দোবন্ধ'। বস্তুতঃ ছন্দোবন্ধ (অর্থাৎ ধ্বনিসমাবেশ) বলতে পর্ব, পদ ও পংক্তি এই তিনের সমবেত আয়তন ও রূপ বোঝায়। এই তিনের সমবেত রূপকেই বলি ছন্দের আকৃতি।

সুতরাং ছন্দোবন্ধ ও ছন্দ-আকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে পর্ব, পদ ও পংক্তি, একে-একে এই তিনেরই আয়তন ও রূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ পর্ববন্ধ (foot forms), পদবন্ধ (clause forms) ও পংক্তিবন্ধের (verse forms) সমবায়েরই নাম ছন্দোবন্ধ (metrical forms) এবং তার দ্বারাই ছন্দের আকৃতি বা রূপ নিয়ন্ত্রিত হয়।

মাত্রাসমাবেশ বা পর্ববন্ধ

প্রথমেই পর্বের আয়তনগত রূপের কথা ধরা যাক। পর্বের আয়তন নির্ভর করে তার অন্তর্গত মাত্রাসংখ্যার উপরে। পর্বের আয়তন ছন্দোরীতিভেদে বিভিন্ন রকম হয়। যেমন—

(১) দলবৃত্ত রীতিতে পর্বের মাত্রাসংখ্যা সাধারণতঃ চারের কম বা বেশি হয় না। অর্থাৎ চতুর্দল পর্বই (tetrasyllabic foot) দলবৃত্ত রীতির ছন্দের প্রধান উপাদান। দৃষ্টান্ত—

ভজন পূজন | সাধন আরা | -ধনা ‖
সমস্ত থাক | পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে | দেবালয়ের | কোণে ‖
কেন আছিস | ওরে !
অন্ধকারে | 'লুকিয়ে' আপন | মনে ‖
কাহারে তুই | পূজিস সংগো | -পনে, ‖
নয়ন মেলে | দেখ দেখি তুই | চেয়ে ‖
দেবতা নেই | ঘরে।

—'গীতাঞ্জলি', ১১৯

এর প্রথম দুই পংক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পংক্তি চৌপদী ; প্রত্যেক পংক্তির শেষ পদে দুই পর্ব—একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ, অন্য পদগুলিতে তিন পর্ব—দুটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ ; প্রত্যেক পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা চার, অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা দুই। এই হচ্ছে এই রচনাটির বন্ধপরিচয়।

তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদের দ্বিতীয় পর্বে দৃশ্যতঃ পাঁচটি দল আছে মনে হলেও কানের সাক্ষ্য নিলে চার দলই পাওয়া যাবে, পাঁচ দল নয়। কেননা, এখানে 'লুকিয়ে' শব্দটির আসল উচ্চারণরূপ হচ্ছে 'লুকৃয়ে'। স্থতরাং 'লুকিয়ে' শব্দে তিন দল না ধরে ধরতে হবে দুই দল। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য এই অধ্যায়ের শেষ উপচ্ছেদে।

দেখা গেল দলবৃত্ত রীতির ছন্দে পর্বের আয়তন চার দলের বেশি হয় না। কিন্তু এই রীতির ছন্দে মাঝে মাঝে তিন বা দুই দলের পর্ব দেখা যায়। যেমন—

চোদ্দ বছর | ক' দিনে হয় || জানিনে মা | ঠিক,
'দণ্ডক বন' | আছে কোথায় || ঐ মাঠে কোন্ | দিক্।
কিন্তু আমি | পারি যেতে || ভয় করিনে | তাতে
'লক্ষ্মণ ভাই' | যদি আমার || থাকত সাথে | সাথে।

—'শিশু', বনবাস

'দণ্ডক বন' ও 'লক্ষ্মণ ভাই', এই দুটি ত্রিদল পর্ব (trisyllabic foot) লক্ষণীয়। দুই পর্বেই আছে তিনটি করে রুদ্ধদল। এ রকম তিন রুদ্ধদল অনেক সময় চার দলের স্থান অধিকার করে থাকে। এ রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় রুদ্ধদলটির স্থানে একটি মুক্তদলও মাঝে মাঝে স্থাপিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ দুটি রুদ্ধদলের ও একটি মুক্তদলের সমাবেশও মাঝে মাঝে দেখা যায়। যেমন—

যুদ্ধ বাধে | বিদ্রোহীদের | সনে,
'রামসিংহ' | রাণা চলেন | রণে।

—'কথা', বিবাহ

কখনও কখনও ভাবপ্রকাশ বা উচ্চারণবৈচিত্র্য প্রকাশের প্রয়োজনে এক দলের দ্বারাই দুই দলের কাজ চালানো হয়। যেমন—

মেঘের উপর | মেঘ করেছে, ‖ রঙের উপর | রঙ,
মন্দিরেতে | কাঁসরঘণ্টা ‖ বাজল ঠ-ঙ | ঠঙ।

—'কড়ি ও কোমল', বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

'তোমরা এসো | তাঁরি নিমন্ | -ত্রণে ‖
যে যে আছ | মর্তিয়া রাজ | -পুত।'
'জ-য় রাণা | রা-ম সিঙের | জ-য়', ‖
গর্জি উঠে | মাড়োয়ারের | দূত।

—'কথা', বিবাহ

"তুমি থাকবে | আমার বশে ‖ অদ্য এবং | পরে নিত্য,
মনে থাকে | যেন, সুরা, ‖ তুমি আমার | বাঁধা ভৃত্য ;
সর্প নিয়ে | খেলার মত ‖ আমি তোমায় | নিয়ে খেলি"—
এই কথাটি | বলে তারে ‖ ঢ—ক করে | গিলে ফেলি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, 'আলেখ্য', মদ্যপ

এই প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত—

'চুড়ি চা-ই | চুড়ি চাই', সে | হাঁকে

দৃষ্টান্তটিও (পৃ ১২) স্মরণীয়।

এইভাবে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে উচ্চারণবিস্তারের সাহায্যে তুই দলের দ্বারাও চার দলের কাজ চালানো যায়। যেমন—

বাইরে কেবল | জলের শব্দ ‖ ঝু-প ঝু-প | ঝুপ
দস্যি ছেলে | গল্প শোনে ‖ একেবারে | চুপ।

—'কড়ি ও কোমল', বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

এই প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত

না-ই না-ই | নাই গো আমার ‖ কারেও কাজ | নাই।

এবং

অমি বললে | কানে কানে, ‖ 'চু-প চু-প | চুপ'

এই তুটি দৃষ্টান্তও (পৃ ১৩) স্মরণীয়।

(২) কলাবৃত্ত রীতিতে প্রতি পর্বের মাত্রাসংখ্যা চার, পাঁচ, ছয় ও সাত এই

চার রকমই হয়ে থাকে, চারের কম ও সাতের বেশি হয় না। একে একে এই চার রকম আয়তনের কলাবৃত্ত পর্বের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ক। চতুষ্কল পর্ব (tetramoric foot)

কিংশুক | -কুঙ্কুমে ‖ বসিল সে : -জে,
ধরণীর | কিঙ্কিণী ‖ উঠিল বে : -জে।
ইঙ্গিতে | সঙ্গীতে ‖
নৃত্যের | ভঙ্গীতে ‖
নিখিল ত : -রঙ্গিত ‖ উৎসবে : যে।

—'মহুয়া', বরযাত্রা

তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্বযতিটি লুপ্ত হয়েছে ছন্দের খাতিরে। 'সেজে' ও 'বেজে' শব্দের সঙ্গে মিল রাখার জন্য এই যতিটিকে লোপ করেই আবৃত্তি করতে হয়।

খ। পঞ্চকল পর্ব (pentamoric foot)

ছন্দভাঙা | হাটের মাঝে ‖
তরল তালে | নূপুর বাজে, ‖
বাতাসে যেন | আকাশবাণী | ফুটে।
কর্কশেরে | নৃত্য হানি ‖
ছন্দোময়ী | মূর্তিখানি ‖
ঘূর্ণিবেগে | আবর্তিয়া | উঠে।

—'বীথিকা', ছন্দোমাধুরী

এটা পঞ্চকলপর্বিক ত্রিপদী বন্ধ। অধিকতর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

গ। ষট্‌কল পর্ব (hexamoric foot)

কত না বর্ণে | কত না স্বর্ণে | গঠিত ‖
কত যে ছন্দে | কত সংগীতে | রটিত ‖
কত না গ্রন্থে | কত না কণ্ঠে | পঠিত ‖
তব অসংখ্য | কাহিনী।
জগতের মাঝে | কত বিচিত্র | তুমি হে, ‖
তুমি বিচিত্র | -রূপিণী।

—'চিত্রা', চিত্রা

প্রথম পংক্তি চৌপদী ও দ্বিতীয় পংক্তি দ্বিপদী। প্রতি পদে তিন পর্ব, শেষ পর্ব অপূর্ণ (ত্রিকল)। কলাবৃত্ত রীতিতে ষট্‌কল পর্বের প্রয়োগই সর্বাধিক।

ঘ। সপ্তকল পর্ব (heptamoric foot)

গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুবা ||
ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি স্বর ||
সাতটি যেন পোষা | পাখি।
—'সোনার তরী', গানভঙ্গ

কহিলা, 'সেনাপতি, | ধরো কৃপাণ, ||
সৈন্য করো সব | জড়ো।
আমার চেয়ে হবে | পুণ্যবান্‌, ||
স্পর্ধা বাড়িয়াছে | বড়ো!'
—'কথা', মস্তকবিক্রয়

ভাবিছ যে-ভাবনা | একা একা ||
দুয়ারে বসি' চুপে | চুপে,
সে যদি সম্মুখে | দিত দেখা ||
মূর্তি ধরি' কোনো | রূপে,…
তারার কিরণের | কম্পনে ||
নীরব আকাশের | মাঝে,
সুদূর সুরসভা | -অঙ্গনে ||
সুরের স্মৃতি যেথা | বাজে।
—'মহুয়া', ভাবিনী

তিনটি দৃষ্টান্তেরই গঠনপ্রণালী প্রায় একরকম। তিনটিতেই প্রতি পংক্তি দ্বিপদী, প্রতি পদে দুই পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ। পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পংক্তিতে প্রথম পদের অপূর্ণ পর্বে পাঁচ কলা, তৃতীয় দৃষ্টান্তের অনুরূপ অপূর্ণ পর্বে চার কলা; তিন দৃষ্টান্তেরই প্রতি পংক্তিতে দ্বিতীয় পদের অপূর্ণ পদে দুই কলা। তা ছাড়া, প্রথম দৃষ্টান্তে দুই পংক্তির প্রথম পদে মিল নেই, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে অনুরূপ স্থলে মিল আছে।

সপ্তকল পর্বের আরও একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

মৈত্র-করুণার | মন্ত্র দিতে দান ‖
জাগ, হে মহীয়ান্, | মরতে মহিমায় ;
সৃজিছে অভিচার | নিঠুর অবিচার ‖
রোদন-হাহাকার | গগন-মহী ছায়।…

হে রাজ-সন্ন্যাসী, | বিমল তব হাসি ‖
ঘুচাক গ্লানি তাপ | কলুষ সমুদায় ;
ক্রোধেরে অক্রোধে | জিনিতে দাও বল, ‖
চিত যে বিচলিত, | চরণে রাখ তায়।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষের গান', বুদ্ধপূর্ণিমা

পূর্ণ দ্বিপদী বন্ধ। প্রতি পংক্তিতে দুই পদ, প্রতি পদে দুই পূর্ণপর্ব, প্রতি পর্বে সাত কলা।

বাংলা সাহিত্যে সপ্তকল পর্বের প্রয়োগই সর্বাপেক্ষা কম। তাই এরূপ পর্বের কিছু বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

আটকলার পর্ব স্বীকারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আটকলার বিভাগ বস্তুতঃ চতুষ্কল পর্বেরই পদবিভাগ। কোনো কোনো রচনায় চারকলার পরে পর্বযতির বাহুল্য থাকে, আবার অন্যবিধ রচনায় উক্ত পর্বযতি-লোপের বাহুল্য দেখা যায়। এই বাহুল্য ঘটে কবির ভাবগত প্রয়োজন বা ছন্দোগত অভিরুচির ফলে। কিন্তু পর্বযতিলোপহীন চতুষ্কলপর্বিক ছন্দের রচনা বড় দেখা যায় না ; তেমনি পর্বযতিহীন শুধু যুক্তপর্বিক ছন্দের রচনাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য চেষ্টা করলে এই উভয়বিধ ছন্দই রচনা করা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু সেটা সাধারণ রীতি নয়। সাধারণতঃ চতুষ্কলপর্বিক ছন্দের রচনায় উক্ত দুই রূপেরই মিশ্রণ থাকে। তাতে ভাবপ্রকাশের সুবিধা যেমন বাড়ে, তেমনি ছন্দশ্রুতিগত বৈচিত্র্যও বাড়ে। চতুষ্কলপর্বিক ছন্দের পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এখানে আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আশুবোধের সুবিধার জন্য।—

যেখানে সে | বুড়া বট ‖ নামায়ে দিয়াছে জট ‖
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে | দুপুরে

যেখানে বনের কাছে ‖ বনদেব | -তারা নাচে ‖
চাঁদিনিতে | রুনুঝুনু | নূপুরে,
যাব আমি | ভরা সাঁঝে ‖ সেই বেণু | -বন মাঝে ‖
আলো যেথা | রোজ জ্বালে | জোনাকি—
শুধাব মিনতি করে, ‖ 'আমাদের | ঘুমচোরে
তোমাদের | আছে জানা | -শোনা কি ?'
—'শিশু', ঘুমচোরা

এখানে চার জায়গায় পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে ; সেসব স্থলে পর্বযতির চিহ্নও দেওয়া হয়নি। অন্য সর্বত্রই পর্বযতি আছে, তার চিহ্নও আছে।

তোমারে ডাকিনু যবে ‖ কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে ‖ গন্ধ ছিল।
জানি না কী লাগি ছিলে ‖ অন্য মনে,
তোমার দুয়ার কেন ‖ বন্ধ ছিল।···

তোমার সন্ধ্যা ছিল ‖ প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব ‖ বাজানু বীণা।
তারার আলোক মাঝে ‖ মিলি মোর | চিত্ত
ঝংকৃত | তারে তারে ‖ করেছিল | নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্ ‖ -পন্দ ছিল।
—'বীথিকা', উদাসীন

এখানে পর্বযতিলোপের বাহুল্য ঘটিয়ে যুক্তপর্বিক চালের ভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অথচ দুটি পংক্তিতে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে অর্থাৎ নৃত্যের তালকে ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে ঘন ঘন পর্বযতি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ সবটুকুই রচিত হয়েছে চতুষ্কলপর্বিক ছন্দে।

(৩) মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতেও এককালে অমিশ্র কলাবৃত্তের ন্যায় চার, পাঁচ, ছয় ও সাতকলার পর্ব রচিত হত। কিন্তু পাঁচ ও সাত কলার পর্ব খুবই বিরল ছিল ; ছয় কলা ও চার কলার পর্বই ছিল কবিদের প্রধান অবলম্বন ; তার মধ্যে চারকলা পর্বের প্রয়োগই ছিল সর্বাধিক। পাঁচ ও সাত কলার পর্ব বিরল হলেও অপ্রচলিত ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও তার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন—

১। মিশ্ররীতির পঞ্চকল পর্ব

পাপ আয়ানে | শুনিলে কানে,
গঞ্জনা বাণে | বধিবে প্রাণে।…
বংশীর ধ্বনি | যেন হে ফণী,
আমি রমণী | প্রমাদ গণি।
নিদয় বাঁশি | হৃদয়-ফাঁসী
করে উদাসী, | ছুটিয়া আসি।

—ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা

২। মিশ্ররীতির সপ্তকল পর্ব

হয়ে প্রমত্ত ভ্রমমদে | ভ্রমিয়া পদে পদে ‖
চারিদিকে | দেখিতেছ | ধ্বান্ত।
দেহ -পতন নাহি হবে | রতন-সম রবে ‖
মনে বুঝি | জেনেছ নি : তান্ত।

—ঈশ্বর গুপ্ত, 'বোধেন্দুবিকাস', প্রথম অঙ্ক

এটিতে পংক্তির প্রথম পদ গঠিত হয়েছে সাতকলার পর্বযোগে অথচ দ্বিতীয় পদ গঠিত হয়েছে চারকলার পর্ব নিয়ে। এই অভিনবতাটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অন্য রকম অভিনবতার দৃষ্টান্তও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আছে।—

সখা হে, পাপী বটু | কথা কটু বলে তো, ‖
বলুক, বলুক, বলুক | যত বলতে পারে, |
বলতে পারে।
যাবে হে ছারখারে | অহঙ্কারে জ'লে তো ‖
জলুক, জলুক, জলুক | যত জলতে পারে, |
জলতে পারে।

—ঈশ্বর গুপ্ত, 'বোধেন্দুবিকাস', প্রথম অঙ্ক

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মাত্রাসমাবেশবৈচিত্র্য এবং প্রথম পর্বের শেষাংশের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের প্রথমাংশের মিলটুকু লক্ষণীয়। পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে (দ্বিতীয় সর্গ। ১১৬-১৩৩) ও রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলন' কবিতায় অনুরূপ বৈচিত্র্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে মিশ্ররীতির পাঁচ কলা ও সাত কলার পর্ব একেবারেই লোপ পেয়েছে। এই রীতির ছয়কলা পর্বও আধুনিক সাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার প্রয়োগবহুলতা যেমন পাঁচ ও সাত কলার পর্ব থেকে অনেক বেশি, তেমনি তার আয়ুষ্কালও দীর্ঘতর। বস্তুতঃ মিশ্রকলাবৃত্ত ষট্‌কল পর্বের বিলোপ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে 'মানসী' কাব্য রচনার সময় (১৮৮৭-৯০) থেকে। কিন্তু কবিরা এই মিশ্রকলাবৃত্ত পর্ব রচনার দীর্ঘকালীন অভ্যাস সহজে ত্যাগ করতে পারেন নি। 'মানসী' প্রকাশের (১৮৯০) পরেও বেশ কিছুকাল এই রীতির ষট্‌কল পর্ব বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত ছিল। ওই কাব্য প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ বারবার এই রীতিতে ষট্‌কল পর্ব রচনার ত্রুটির প্রতি কবিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই দীর্ঘকালের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করতে পারেন নি। 'মানসী' কাব্য প্রকাশের পরেও তাঁর রচনায় এই রীতির ষট্‌কল পর্ব বার বার দেখা দিয়েছে। যেমন—

বিলম্বে এসেছ, | রুদ্ধ এবে দ্বার, ‖
জনশূন্য পথ, | রাত্রি অন্ধকার, ‖
গৃহহারা বায়ু | করি হাহাকার ‖
ফিরিয়া মরে।—
... ...
যাহারা জাগিছে | নবীন উৎসবে ‖
রুদ্ধ করি দ্বার | মত্ত কলরবে, ‖
কী তোমার যোগ | আজি এই ভবে ‖
তাদের সাথে।

—'চিত্রা', দুঃসময় (১৮৯৪)

সাধু কহে, "শুন, | মেঘ বরিষার ‖
নিজেরে নাশিয়া | দেয় বৃষ্টিধার ; ‖
সব ধর্ম মাঝে | ত্যাগধর্ম সার ‖
ভুবনে।"

কৈলাসশিখর | হতে দূরাগত ‖
ভৈরবের মহা | -সংগীতের মতো ‖
সে বাণী মন্দ্রিল | সুখতন্দ্রারত ‖
ভবনে।

—'কথা', শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা (১৮৯৭)

দুটি দৃষ্টান্তই চৌপদী বন্ধে রচিত। অর্থাৎ এ দুটিরই প্রতি পংক্তিতে আছে চারটি করে পদ।

প্রতিদিন আমি, | হে জীবনস্বামী, ‖
দাঁড়াব তোমারি | সম্মুখে।
করি জোড় কর | হে ভুবনেশ্বর, ‖
দাঁড়াব তোমারি | সম্মুখে।
তোমার বিচিত্র | এ ভবসংসারে ‖
কর্মপারাবার | -পারে হে,
নিখিল-জগৎ | -জনের মাঝারে ‖
দাঁড়াব তোমারি | সম্মুখে।

—'নৈবেদ্য' (১৯০১), ১

এটা রচিত দ্বিপদী বন্ধে। অর্থাৎ এর প্রতি পংক্তিতে আছে দুই পদ।

আধুনিক কালে মিশ্র রীতিতে ষট্‌কল পর্ব রচিত হয় না। ষট্‌কল পর্বের সমস্ত ছন্দই রচিত হয় অমিশ্র রীতিতে। 'মানসী' কাব্য রচনার সময় থেকেই এই প্রথা প্রচলিত হয়েছে।

আধুনিক কালে মিশ্ররীতির সমস্ত প্রকার ছন্দেরই একমাত্র অবলম্বন চার কলার পর্ব। যেমন—

দেখিতে পাও না তুমি ‖ মৃত্যুদূত | দাঁড়ায়েছে | দ্বারে,
অভিশাপ | আঁকি দিল ‖ তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না | যদি ডাক, ‖
এখনও সরিয়া থাক, ‖
আপনারে | বেঁধে রাখ ‖ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে | হবে তবে ‖ চিতাভস্মে | সবার সমান।

—'গীতাঞ্জলি', ১০৮

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পংক্তি চৌপদী। প্রত্যেক পংক্তির শেষ পদে তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ (দুই কলা), অন্য সব পদেই দুই পর্ব, প্রতি পূর্ণ পর্বে চার কলা। সাতটি প্রত্যাশিত স্থানে পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে, অন্য সাত জায়গায় প্রত্যাশিত পর্বযতির অভাব ঘটেনি।

অমিশ্র রীতির ন্যায় মিশ্র রীতিতেও আট বা দশ কলার পর্ব স্বীকারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। অমিশ্র কলাবৃত্ত পর্বের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা মিশ্র কলাবৃত্ত সম্পর্কেও সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য।

দেখা গেল পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব একমাত্র অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতেই চলে, অন্য দুই রীতিতে চলে না। চার মাত্রার পর্ব চলে তিন রীতির ছন্দেই এবং এই চার মাত্রার পর্বই দলবৃত্ত ও মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির একমাত্র অবলম্বন।

পর্বই ছন্দরচনার প্রধান উপাদান আর পর্বগঠনের বৈচিত্র্যও কম নয়। তাই এ বিষয়ের আলোচনা কিছু বিস্তৃতভাবেই করা গেল। পদের বৈচিত্র্যও প্রধানতঃ নির্ভর করে পর্বের বৈচিত্র্যের উপরেই। পদের নিজের বৈচিত্র্য খুব বেশি নয়। তার পরিচয়ও তাই সংক্ষেপেই শেষ করা যাবে।

পর্বসমাবেশ বা পদবন্ধ

পর্বের উপাদান মাত্রা এবং মাত্রাসংখ্যার দ্বারাই পর্বের আয়তন বা আকৃতি নিরূপিত হয়। তেমনি পদের প্রত্যক্ষ উপাদান পর্ব এবং পর্বসংখ্যার দ্বারাই পদের আয়তন বা আকৃতি নিরূপিত হয়।

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত, তিন রীতিতেই পদ গঠিত হয় সাধারণতঃ দুই ও তিন পর্বের যোগে। পদের শেষ পর্ব অনেক সময় অপূর্ণ থাকে এবং এই অপূর্ণতার দ্বারাও পদের বৈচিত্র্য সাধিত হয়। পূর্ববর্তী অনেক দৃষ্টান্তের বর্ণনা-কালেই পদবৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার থেকেই এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। তথাপি আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্য আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

(ক) দ্বিপর্বিক পদ

১। দলবৃত্ত রীতিতে

দূরে অশথ | -তলায় ‖
পুঁতির কণ্ঠিখানি | গলায় ‖
বাউল দাঁড়িয়ে কেন | আছ।
সামনে আঙি | -নাতে ‖
তোমার একতারাটি | হাতে ‖
তুমি সুর লাগিয়ে | নাচ।
—'শিশু ভোলানাথ', বাউল

২। কলাবৃত্ত রীতিতে

যদি দেখি ঘন ঘোর | মেঘোদয় ‖
দূর ঈশানের কোণে | আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী | জ্বালাময় ‖
তার উদ্যত ফণা | বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি | মিছা ভয়, ‖
আমি করিব নীরবে | তরণ
সেই মহাবরষার | রাঙাজল ‖
ওগো মরণ, হে মোর | মরণ।
—'উৎসর্গ', ৪৫

এই দুটি দৃষ্টান্তেই কয়েকটি শব্দকে রচনার মূল দেহ থেকে একটু দূরে সরিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয়েছে। এগুলিকে একটু আলগাভাবে উচ্চারণ করতে হয়, অর্থাৎ এগুলির উপরে কোনো প্রস্বর থাকে না। এগুলি বক্তব্য বিষয়ের অচ্ছেদ্য অংশ বটে, কিন্তু ছন্দের পক্ষে অত্যাজ্য না হয়েও তার ধ্বনিতরঙ্গে অর্থাৎ স্পন্দভঙ্গিতে একটু বৈচিত্র্য ঘটায়। এরকম বিচ্ছিন্ন অংশকে ছন্দপরিভাষায় বলি **অতিপর্ব** (Anacrusis)।

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে

যে তোমারে | দূরে রাখি ‖ নিত্য ঘৃণা | করে ‖
হে মোর স্বদেশ,

মোরা তারি | কাছে ফিরি ‖ সম্মানের | তরে ‖
পরি তারি | বেশ।

—'কল্পনা', ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় ‖ পশ্চিম মন্দিরে ‖
দূর সিন্ধু | -তীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি, ‖ জয়মাল্য | -খানি ‖
সেথা হতে | আনি'
দীন হীনা | জননীর ‖ লজ্জানত | শিরে ‖
পরায়েছ | ধীরে।

—'কল্পনা', জগদীশচন্দ্র বসু

দুটিই ত্রিপদীবন্ধে রচিত। দুটিরই প্রতি পংক্তির প্রথম পদে দুই পূর্ণপর্ব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ (দুই কলার) পর্ব। দুই দৃষ্টান্তের পার্থক্য শুধু মিলের। প্রথমটিতে দুই পংক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে পর্যায়ক্রমিক মিল, আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে মিল।

(খ) ত্রিপর্বিক পদ

১। দলবৃত্ত রীতিতে

শরৎ, তোমার | শিশির-ধোওয়া | কুন্তলে·‖
বনের পথে | লুটিয়ে-পড়া | অঞ্চলে
আজ প্রভাতের | হৃদয় ওঠে | চঞ্চলি।…
কুঞ্জছায়া | গুঞ্জরণের | সংগীতে ‖
ওড়না ওড়ায় | এ কী নাচের ভঙ্গিতে, ‖
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে | আন্দোলি।

—'গীতালি', ২৬

২। কলাবৃত্ত রীতিতে

এ নহে মুখর | বনমর্মর | গুঞ্জিত, ‖
এ যে অজাগর | -গরজে সাগর | ফুলিছে।

এ নহে কুঞ্জ | কুন্দকুসুম | -রঞ্জিত, ‖
ফেনহিল্লোল | কলকল্লোলে | দুলিছে।
কোথা রে সে তীর | ফুলপল্লব | -পুঞ্জিত ‖
কোথা রে সে নীড়, | কোথা আশ্রয় | -শাখা!
তবু বিহঙ্গ, | ওরে বিহঙ্গ | মোর,
এখনি অন্ধ, | বন্ধ করো না | পাখা।

—'কল্পনা', দুঃসময়

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে

আকাশের |একবিন্দু | নীলে ‖
তোমার প ⁝ রাণ ডুবা ⁝ ইলে, ‖
শিখে নিলে | আনন্দের | ভাষা।
বক্ষে তব | শুভ্র রেখা | এঁকে ‖
আপন স্বা ⁝ ক্ষর গেছে | রেখে ‖
রবির সু ⁝ দূর ভালো | -বাসা।

—'পূরবী', আকন্দ

এটা ত্রিপদীবন্ধে রচিত। প্রতি পংক্তিতে তিন পদ, প্রতি পদে তিন পর্ব, শেষ পর্ব অপূর্ণ (দুই কলা)।

পদসমাবেশ বা পংক্তিবন্ধ

পদের প্রত্যক্ষ উপাদান পর্ব এবং পর্বসংখ্যার দ্বারাই পদের আকৃতি নিরূপিত হয়। তেমনি পংক্তির প্রত্যক্ষ উপাদান পদ এবং পদসংখ্যার দ্বারাই পংক্তির আকৃতি নিরূপিত হয়। তাই পংক্তিবৈচিত্র্যও পদবৈচিত্র্যের উপরেই নির্ভর করে। পদগঠনের ন্যায় পংক্তিগঠনেরও স্বকীয় বৈচিত্র্য খুব বেশি নয়।

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত, তিন রীতিতেই পংক্তি গঠিত হয় সাধারণতঃ এক, দুই, তিন বা চার পদের যোগে। অর্থাৎ তিন রীতিতেই পংক্তিবন্ধ চার রকম— একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী। পূর্বগামী নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় ও পরবর্তী অধ্যায়ের তৃতীয় উপচ্ছেদে এই চতুর্বিধ পংক্তিবন্ধের নানারকম দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আশা করি তার থেকেই পংক্তিবন্ধ

সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। তথাপি পূর্ণতার খাতিরে এখানেও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১। দলবৃত্ত একপদী

শরৎ, তোমার | অরুণ আলোর | অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল | ছাপিয়ে মোহন | অঙ্গুলি।…
মানিক-গাঁথা | ওই যে তোমার | কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় | তোমার শ্যামল | অঙ্গনে।

—'গীতালি', ২৬

২। কলাবৃত্ত একপদী+চৌপদী

মোর ত্যাগে যে তোমার | হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার | পরিচয়।
মোর ধৈর্য তোমার | রাজপথ ‖
সে যে লঙ্ঘিবে বন | -পর্বত, ‖
মোর বীর্য তোমার | জয়রথ, ‖
তোমারি পতাকা | শিরে বয়।

—'গীতালি', ২৮

৩। কলাবৃত্ত দ্বিপদী

ফাল্গুনী | পূর্ণিমা, ‖ ঝরিতেছে | জ্যোৎস্নার | ঝর্ণা,
লক্ষ তা : রকা-আঁখি ‖ মেলিয়াছে | নীলাকাশ | শূন্যে।
নিম্নে ধরণীবধূ কি মধুর স্বর্ণ-বর্ণা,
বিশ্ব শান্তিময় জ্যোৎস্নামিলনপ্রেম-পুণ্যে।
কিশলয়-গুঞ্জনে ভরিয়াছে মধুবন-বীথিকা,
পত্রের মর্মরে রণিতেছে অশ্রুত গীতিকা।
সমীরণ-হিল্লোলে বিহ্বল কল্পনা ভাসিছে,
দক্ষিণা কানে কানে কি বার্তা কহিতেছে পুলকে ;
লক্ষ যোজন হতে কে যেন কাহার লাগি আসিছে,
তারি আগমনী গান রণিতেছে স্বর্গে ও ভূলোকে।

—জগদীশ ভট্টাচার্য, 'ক্ষণ-শাশ্বতী', মধুঋতু

প্রথম দুই পংক্তিতে যথারীতি যতিচিহ্ন দেওয়া গেল। আশা করি তার থেকেই সমগ্র অংশটির ছন্দোরূপ পরিস্ফুট হবে। চিহ্নবাহুল্যভয়ে ও পাঠ-সৌকর্যের খাতিরে অন্য পংক্তিগুলিকে অচিহ্নিতই রাখা গেল। বলা বাহুল্য, সবগুলি পংক্তিই দ্বিপদী। প্রথম পদে দুই পর্ব, দ্বিতীয় পদে তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ (তিন কলা)।

৪। কলাবৃত্ত ত্রিপদী

আনন্দিত | মন আজি ‖
কী সংগীতে | উঠে বাজি, ‖
বিশ্ববীণা | পেয়েছি যেন | বুকে।
সকল লাভ | সব ক্ষতি ‖
তুচ্ছ আজি | হল অতি ‖
দুঃখ সুখ | ভুলে যাওয়ার | সুখে।

—'বীথিকা', নবপরিচয়

৫। মিশ্রকলাবৃত্ত একপদী+ত্রিপদী+দ্বিপদী

হাসিয়ো ম : ধুর উচ্চ : হাসে
অকারণ | নির্মল উল্ : লাসে ;
বন সর : সীর তীরে ‖
ভীরু কাঠ | -বিড়ালীরে ‖
সহসা চ : কিত করো | ত্রাসে।
ভুলে যাওয়া | কথাগুলি ‖ কানে কানে | করায়ে স্ম : রণ
দিব না মন্ : থর করি ‖ ওই তব | চঞ্চল চ : রণ।

—'পূরবী', শেষ বসন্ত

আধুনিক কালে কোনো পংক্তিতে চারটির বেশি পদ সমাবিষ্ট হয় না। অর্থাৎ চৌপদীই দীর্ঘতম পংক্তিবন্ধ। রবীন্দ্রপূর্ব যুগে এক-এক পংক্তিতে বহু পদের সমাবেশ ঘটানো হত, তাতে ছন্দের ধ্বনিসৌষম্য অব্যাহত থাকত না। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে ও-রকম যথেচ্ছ পদসমাবেশের প্রথা লুপ্ত হয়েছে।

পংক্তিসমাবেশ বা শ্লোকবন্ধ

প্রণালীবদ্ধ পদসমাবেশকে বলেছি পংক্তিবন্ধ। তেমনি প্রণালীবদ্ধ পংক্তি-সমাবেশকে বলা যায় **শ্লোকবন্ধ** (verse group)। শ্লোকবন্ধকেও চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সমায়তন, সমপ্রণালীতে রচিত ও অন্যোন্যসাপেক্ষ দুই পংক্তির সমাবেশকে বলব **যুগ্মক** (couplet) এবং অনুরূপভাবে গুচ্ছবদ্ধ তিন ও চার পংক্তির সমাবেশকে যথাক্রমে বলব **ত্রিক** (triplet) ও **চতুষ্ক** (quartet)। চারের অধিক পংক্তির প্রণালীবদ্ধ সমাবেশকে বলা যায় **কুলক** (stanza)। কুলকও আবার পংক্তিসংখ্যা অনুসারে পঞ্চক (quintet), ষট্ক (sestet), সপ্তক (heptet), অষ্টক (octave) ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। কুলকের পংক্তিগুলি সমপ্রণালীতে রচিত হওয়া চাই, কিন্তু সেগুলি সমায়তন হওয়া অত্যাবশ্যক নয়।

সব রকম শ্লোকবন্ধেই পংক্তিপ্রান্তে নির্দিষ্টপ্রণালীতে সজ্জিত মিলের ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন প্রকার শ্লোকবন্ধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিলস্থাপনের রীতি সম্বন্ধেও যথোচিত মন্তব্য সংযুক্ত হল।—

১। যুগ্মক (couplet)

দুঃখসহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

—'পূরবী', চিঠি

এখানে দুটি যুগ্মক উদ্ধৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ দুটি দলবৃত্ত রীতিতে রচিত। যুগ্মকে স্বভাবতঃই দুই পংক্তির মধ্যেই মিল থাকে, অন্য রকম মিল স্থাপনের অবকাশ নেই।

২। ত্রিক (triplet)

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি.
অন্তবিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবণমরণ হরণ করি।

—'মানসী', ধ্যান

এই ত্রিকবন্ধটি রচিত কলাবৃত্ত রীতিতে। যুগ্মকের ন্যায় এর মিলও পারম্পরিক। ত্রিকবন্ধের আর-এক রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

জয় জয় ভারত, জয় জয় মাতা,
ঋদ্ধির নিধান, সিদ্ধির দাতা,
অক্ষয় তোমার কীর্তির গাথা।
জয় জয়।
দুর্দম তোমার শৌর্যের বরে
পর্বত দাঁড়ায় গর্বের ভরে
সূর্যের গমন রোধবার তরে।
জয় জয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'বেলাশেষের গান', ভারতের আরতি

বাংলায় যুগ্মকবন্ধেরই প্রাধান্য। ত্রিকবন্ধের রচনা অতি বিরল।

৩। চতুষ্ক (quartet)

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ;
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।

—'কড়ি ও কোমল', প্রাণ

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। মিল পর্যায়ক্রমিক। আর-একটি দৃষ্টান্ত।—

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
যে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায় ;
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

—'কড়ি ও কোমল', ছোটো ফুল

এখানে মিল ঘটানো হয়েছে প্রথম-চতুর্থ ও দ্বিতীয়-তৃতীয় পংক্তিতে। এ-রকম মিল অপেক্ষাকৃত বিরল।

৪। কুলক (stanza)

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে ;—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।
—'চিত্রা', উর্বশী

এই কুলকবন্ধটিতে মোট নয়টি পংক্তির সমাবেশ ঘটেছে। এর মিলগুলিও পংক্তিক্রমিক। তিনটি মিল দ্বিপংক্তিক, একটি ত্রিপংক্তিক। মূল রচনাটির (উর্বশী) প্রত্যেকটি কুলকবন্ধই এই প্রণালীতে গুচ্ছবদ্ধ। সমগ্র রচনাতে এক প্রণালীর শ্লোকবন্ধ গঠন করাই কবিস্বীকৃত রীতি।

পংক্তিবন্ধের আলোচনাপ্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত তৃতীয় দৃষ্টান্তটিও (কলাবৃত্ত দ্বিপদী) বহুপংক্তিক কুলকবন্ধে রচিত। ওটিতে আছে মোট দশ পংক্তি। মধ্যবর্তী দুটি মিল পংক্তিক্রমিক, বাকিগুলি পর্যায়ক্রমিক।

অধুনাপূর্ব যুগে শুধু যুগ্মক রচনার রীতিই প্রচলিত ছিল। অন্যবিধ শ্লোকবন্ধ রচনার প্রচলন ঘটেছে আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে। তথাপি এখনও যুগ্মকেরই প্রাধান্য। অন্যবিধ শ্লোকবন্ধের মধ্যে ত্রিক রচনার দৃষ্টান্তই সর্বাপেক্ষা কম। চতুষ্কও খুব বেশি নয়। কুলকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। কুলকরচনায় কবির স্বাধীনতাও বেশি। কুলকে পংক্তিসংখ্যা, তার আয়তন ও তার মিলের ক্রম, সবই নির্ভর করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন ও কবির অভিরুচির উপরে।

মিল

শ্লোকবন্ধের আলোচনায় মিলের কথা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। এ স্থলে মিলেরও একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

দুটি স্বতন্ত্র দল বা দলগুচ্ছের প্রথম ব্যঞ্জনটি বাদে বাকি (স্বর ও ব্যঞ্জন) ধ্বনিগুলির যথানুক্রমিক শ্রুতিসাম্যের নাম **মিল** (rime)। এর থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়, দুটি মুক্তদলের মিল মানে হচ্ছে শুধু স্বরবর্ণের শ্রুতিসাম্য। যেমন—

ধুলার মাঝে | না যদি দেন | পা,
তা হলে পায়ে | ধুলা তো লাগে | না।

—'কল্পনা', জুতা-আবিষ্কার

সখী, প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে!
তারে আমার মাথার | একটি কুসুম | দে।

—'কল্পনা', সকরুণা

সেদিন বরষা | ঝরঝর ঝরে ‖ কহিল কবির | স্ত্রী,...
'মাথার উপরে | বাড়ি পড়ো পড়ো, ‖ তার খোঁজ রাখ | কি?'

—'সোনার তরী', পুরস্কার

এ রকম ব্যঞ্জননিরপেক্ষ স্বরবর্ণের মিলকে অর্থাৎ শুধু স্বরধ্বনির শ্রুতিসাম্যকে বলি 'স্বরানুপ্রাস' (assonance)। সমস্ত মিলের মূলে অর্থাৎ প্রথমেই থাকে এই স্বরানুপ্রাস। স্বরানুপ্রাসহীন মিলকে যথার্থ মিল বলা যায় না। এই প্রাথমিক স্বরানুপ্রাসের পরবর্তী সমস্ত ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির যথাক্রমিক শ্রুতিসাম্য না থাকলেও যথার্থ মিল হয় না। এবার পূর্ণ ও অপূর্ণ মিলের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

যাবার দিনে | এই কথাটি | বলে যেন | যাই—
'যা দেখেছি, | যা পেয়েছি, | তুলনা তার | নাই।'

—'গীতাঞ্জলি', ১৪২

অরূপ তোমার | রূপের লীলায় | জাগে হৃদয় | -পুর,
আমার মধ্যে | তোমার শোভা | এমন সুম | -ধুর।

—'গীতাঞ্জলি', ১২০

এই দুটিই (যাই-নাই, পুর-ধুর) রুদ্ধদলের মিল। প্রথম ব্যঞ্জন বাদে বাকি অংশ (আই, উর) যথানুক্রমিকভাবে অবিকল এক।

সুন্দর, তুমি | এসেছিলে আজ | প্রাতে
অরুণবরণ | পারিজাত লয়ে | হাতে।

—'গীতাঞ্জলি', ৪৭

কোথা গেল সেই | মহান্ শান্ত ||
নবনির্মল | কোমলকান্ত ||
উজ্জ্বলনীল | বসনপ্রান্ত ||
সুন্দর শুভ | ধরণী ।
আকাশ আলোক পুলকপুঞ্জ,
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ,
কোথা নিয়ে এল তরণী ।
—'চিত্রা', নগর-সংগীত

আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে,
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে ।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায় ।…
রইল মাত্র দিবারাত্র প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবীকেলে কীর্তিকলাপ ।
—'ক্ষণিকা', ক্ষতিপূরণ

একক মুক্তদলের মিল (পা-না, কে-দে, স্ত্রী-কি) বেশি দেখা যায় না। একক রুদ্ধদলের (যাই-নাই, পুর-ধুর) এবং দুই মুক্তদলের (প্রাতে-হাতে) মিলই দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। আদিগুরু দ্বিদল মিলও (শান্ত-কান্ত, পুঞ্জ-কুঞ্জ) ছন্দোবিলাসী কবিদের খুব প্রিয়। অন্ত্যগুরু দ্বিদল মিল (প্রলাপ-কলাপ) তার তুলনায় বিরল।

'পাকপ্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন ।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন ।
—'প্রহাসিনী', পরিণয়মঙ্গল

এটা একটি পঞ্চক অর্থাৎ পঞ্চপংক্তিক কুলক। এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় উভগুরু দ্বিদল (রন্ধন-বন্ধন-ক্রন্দন) এবং ত্রিলঘু (লুচিটা-মুচিটা) মিলের প্রয়োগ। পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তের 'ধরণী-তরণী' মিলটাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই দ্বিবিধ মিলের প্রয়োগও যথেষ্ট দেখা যায়।

আমরা দেখলাম একদল মিল হতে পারে দুই রকম—মুক্ত ও রুদ্ধ। দৃষ্টান্ত যথাক্রমে—কে-সে, সুখ-দুখ। দ্বিদল মিল চার রকম—আদিরুদ্ধ, আদিমুক্ত, উভমুক্ত. উভরুদ্ধ। দৃষ্টান্ত যথাক্রমে—শান্ত-কান্ত, করুণ-তরুণ, লীনা-বীণা, অঞ্চল-চঞ্চল। ত্রিদল মিল হতে পারে আট রকম। চতুর্দল ও পঞ্চদল মিলের প্রকারভেদ আরও অনেক বেশি। পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে তার প্রতি একটু মন দিলেই বহুবিধ মিলের পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

তার পরে এল গণৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
বাজায়ে সে গেল চলি।

—'সোনার তরী', পুরস্কার

'গণৎকার-ঝনৎকার' তিন দলের পূর্ণ মিল। কিন্তু 'চমৎকার'-এর মিলটা নিখুঁত নয়। খুঁত হয়েছে ন-এর স্থলে ম-স্থাপনে।

নানা বেশভূষা হীরা রুপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা,
সাজ করে লও পূরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক।...
আসে গুটিগুটি বৈয়াকরণ
ধূলিমাখা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে।

—'সোনার তরী', পুরস্কার

'রূপা সোনা-উপাসনা' পূর্ণ চতুর্দল মিল বলেই স্বীকার্য। তার সঙ্গে 'বাসনা'র মিলটা সর্বাঙ্গীণ নয়। 'বৈয়াকরণ-লইয়া চরণ' মিলটা চতুর্দল মিল বলে স্বীকার্য নয়। বস্তুতঃ এখানে দুটি স্বতন্ত্র মিলের (বৈয়া-লইয়া, করণ-চরণ) সমাবেশ ঘটেছে। তৃতীয় পদের 'তরণ' অংশটা ওই দ্বিতীয় মিলেরই সমপর্যায়ভুক্ত। 'বৈয়া-লইয়া' মিলটার তৃতীয় সহচর মেলেনি।

রূপযৌবন উপঢৌকন
দেবেন কন্যা তাহারে,
তাই পরেছেন চীনাংশুকের
পট্টবসন বাহারে।

—'ছন্দ' (১৯৬২), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (২), পৃ ৭৮

'রূপযৌবন-উপঢৌকন' মিলটাও চার দলের মিল নয়, একটি দ্বিদল ও দুটি একদল মিলের, মোট তিনটি মিলের (রূপ-যৌ-বন, উপ-ঢৌ-কন) সমাবেশমাত্র। এরকম মিলসমাবেশের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ঐ শেফালিকাতলে
কে বালিকা চলে ?

—নজরুল, 'অগ্নিবীণা', আগমনী

ছোট্টলেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট লেবুর ফুল—
স্বর্ণ উষার কর্ণভূষার বর্ণ তুষার দুল !
চন্দ্রধবল সরসকান্তি
চন্দনজল পরশশান্তি,
মন্দমারুত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল !

—যতীন্দ্রমোহন, 'নীহারিকা', নেবুফুল

রজনীগন্ধা বাস বিলালো—
সজনি, সন্ধ্যা,—আস্‌বি না লো ?···
বঁধুর চিত্তে দোলা রে ছন্দ,
মধুর নৃত্যে ভোলা রে বন্ধ।

—যতীন্দ্রমোহন, 'নীহারিকা', সন্ধ্যায়

বলা অনাবশ্যক যে, মিলের অতিবাহুল্যে কাব্যমূল্যের হানি ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

মিলের ত্রুটি বা অপূর্ণতারও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।—

আর নাই রে বেলা, নামলো ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্ রে ছুটে কলসখানি ভরে নিতে।

—'গীতাঞ্জলি', ২৬

'ধরণীতে-ভরে নিতে' পূর্ণ মিল নয়। 'ধরণীতে-তরণীতে' পূর্ণ মিল।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র-রূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

—'চিত্রা', চিত্রা

রূপিণী-গামিনী, আলোকে-পুলকে, ঝলসিছ-উলসিছ-বিলসিছ, নীল-ফুল-চল, গগনে-কাননে-চরণে—এই সবগুলি মিলই অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার ত্রুটি কানকে খুব পীড়িত করে না অনুপ্রাসমাধুর্যের প্রভাবে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

—'কল্পনা', দুঃসময়

'মন্থরে-মন্তরে' যথার্থ মিল নয়, তার কারণ আদিব্যঞ্জনের অভিন্নতা। 'মন্থরে-অম্বরে' মিলও ত্রুটিহীন নয়, তার কারণ মধ্যব্যঞ্জনের ভিন্নতা। এই ত্রুটির ক্ষতি কিছু পরিমাণে পূরণ হচ্ছে রচনাটির স্পন্দসৌষম্য ও অনুপ্রাসমাধুর্যের দ্বারা।

তিন ও তার চেয়ে বেশি দলের মিল অনেক সময়ই অপূর্ণ থাকে। রচনার প্রয়োজনে কবিরা ওই অপূর্ণতাকেই স্বীকার করে নেন। পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতেও মাঝে মাঝে এরূপ অপূর্ণ মিল লক্ষিত হবে। রচনার অন্যবিধ গুণে এসব ত্রুটি পীড়াদায়ক হয় না। কিন্তু একক রুদ্ধদলের কিংবা দুই মুক্ত দলের মিল অপূর্ণ হলে (যেমন—প্রাণ-দিন, শেষ-বিষ, আজি-খুঁজি) তা অসহনীয় হয়।

মিলের অবস্থানটাও লক্ষণীয়। পংক্তিতে-পংক্তিতে মিল থাকাই সাধারণ রীতি। তার পরেই পদে-পদে মিল। পর্বে-পর্বে মিল অপেক্ষাকৃত কম। পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতেই তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। তথাপি এস্থলে দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বরূপ দেখানো প্রয়োজন।—

নৌকা ফি সন | ডুবিছে ভীষণ, | রেলে কলিশন | হয়।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, 'হাসির গান', নন্দলাল

এখানে 'ফি সন-ভীষণ-লিশন' এই মিলটা যথার্থ পর্বপ্রান্তিক মিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বিখ্যাত রচনা

'বিবিজান | চলে যান | লবেজান | করে।'

এই লাইনটির ('ইংরাজি নববর্ষ') 'জান-যান-জান' যথার্থ মিল নয়, কারণ প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নতা অর্থাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য। রবীন্দ্ররচিত

'ভুপুরাম | অবিরাম | বিশ্রাম | -শালী সে।'

এই লাইনটির ('খাপছাড়া', ৪৬) 'রাম-রাম-রাম'ও যথার্থ মিল নয়, কারণ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য। রবীন্দ্রনাথের আরও একটি লাইন ('কল্পনা', উন্নতিলক্ষণ) এই।—

'শলাকাবিদ্ধ | হতেছে | সিদ্ধ | মনুনিষিদ্ধ | পক্ষী।'

এখানে 'বিদ্ধ-সিদ্ধ' যথার্থ মিল বটে। কিন্তু 'সিদ্ধ-ষিদ্ধ' যথার্থ মিল নয়। এরূপ পূর্ণ ধ্বনিসাম্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে যমক ও অর্ধযমকের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। অতএব সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

যমক ও অর্ধযমক

একথা সকলেই জানে যে, একই শব্দের বা শব্দগুচ্ছের একাধিক বার ভিন্নার্থপ্রয়োগের নাম **যমক**। এই শব্দদ্বয় বা গুচ্ছদ্বয় বর্ণবিন্যাসে একরূপ না হলেও চলে, কিন্তু শ্রুতধ্বনিতে একরূপ হওয়া চাই। যেমন—'প্রভাকরে-প্রভা করে',

এই যমকটা শুধু শ্রুতধ্বনিতে নয়, বর্ণবিন্যাসেও একরূপ। কিন্তু 'বাঁদর-বাঁ দোর' কিংবা 'হাসিতে-হা সীতে', এখানে বর্ণসাম্য না থাকলেও ধ্বনিসাম্য (তথা শ্রুতি-সাম্য) আছে। অতএব এদুটিও যমক।

যমক শব্দালংকার বলেই স্বীকৃত, অর্থালংকার বলে নয়। কিন্তু এই মত সর্বতোভাবে সমর্থনীয় নয়। যমক অংশতঃ অর্থালংকার বলেও স্বীকার্য, তা না হলে তার সংজ্ঞানিরূপণে 'ভিন্নার্থ'-প্রয়োগের কথা উঠত না। বস্তুতঃ অনুপ্রাসের ন্যায় যমক বিশুদ্ধ ধ্বনিগত অলংকার নয়, অংশতঃ অর্থগতও বটে। তবে ছন্দের আলোচনায় যমকের প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু তার অর্থগত অলংকারত্ব নয়। তার ধ্বনিগত অলংকারত্বই আমাদের আলোচ্য। কারণ ধ্বনি নিয়েই ছন্দের কারবার, আর প্রয়োজন হলে যমকের দ্বারাও মিলের কাজ চালানো যায়। একটু পরেই তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

তার পূর্বে এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, যমকের ন্যায় মিলও ছন্দের অত্যাজ্য অঙ্গ নয়, তার প্রমাণ 'অমিত্রাক্ষর' বন্ধ। বস্তুতঃ মিল ও যমক, দুই-ই ছন্দের অলংকরণমাত্র, তবে ধ্বনিগত অলংকরণ।

আধুনিক যুগে মিলের বৈচিত্র্যসাধনে খুব তৎপরতা দেখা যায়। তার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু মিল সম্বন্ধে কবিরা যত উৎসুক, যমক সম্বন্ধে তাঁরা ততই বিমুখ। রবীন্দ্রসাহিত্যেও মিলবৈচিত্র্যের প্রাচুর্য যেমন অপরিমেয়, যমকের নিদর্শন তেমনি দুর্লভ। অথচ এক সময়ে যমক-রচনার অতি-বিলাস বাংলাসাহিত্যকে পেয়ে বসেছিল বললেই হয়। বোধ করি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই যমকের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি। তাঁর রচনা থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

কুসুমের বাস ছেড়ে কুসুমের 'বাস'
বায়ু ভরে এসে করে নাসিকায় 'বাস'॥

—ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), প্রণাম তোমায়

নিজ মান চাই শুধু, কারে নাহি 'মানি'।
সে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব 'মানী'?
সরলতা কর যদি সবার 'সহিত',
তবেই সন্তোষ লাভ, সহজে 'স্বহিত'॥

—ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), সাম্য

যমকপ্রয়োগের আর-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিগত দিন' (১৩৬৪) বইটি থেকে।—

টালায় প্রকাশ নামে থাকে এক 'ডাক্তার',
ভারি তার হাতযশ, ভারি নাম-'ডাক তার'।
মাঠ দিয়ে হন হন চ'ড়ে যায় 'পালকি',
ও গ্রামের জমিদার নটবর 'পাল কি' ?
কবিতা বেরিয়েছিল বসুমতী 'মাসিকে',
প'ড়ে তাই শোনালাম বিনোদিনী 'মাসিকে'।
টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস 'বার্ণিস' ?
দাম চাস্ ? আজ নয়, মঙ্গল-'বার নিস্'।

—পরিচ্ছেদ ৯, পৃ ৪৭-৪৮

বলা বাহুল্য, হাস্যরস ছাড়া অন্যরকম সাহিত্যরস সৃষ্টির পক্ষে যমক অলংকার বিশেষ সহায়ক নয়, বরং অন্তরায় হবারই সম্ভাবনা বেশি। এমন কি, হাস্যরস-সৃষ্টিতেও যমকের চেয়ে মিলেরই ক্ষমতা বেশি। তার বহু প্রমাণ আছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

এই অতি গম্ভীর সভা,
সবাই ধ্যানে মগ্ন ;
ছুরি এবং ফর্কে,—
ধারাল সব তর্কে,
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন
করছেন বসে ভগ্ন।

—'আষাঢ়ে', শ্রীহরি গোস্বামী

পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত ছেলেবেলায় খান নি কে ?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসছেন আহ্নিকে।

—'হাসির গান', হল কি !

পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো বলে সর্ব শাস্ত্রী,—
কুমীর ধরলে ছাড়ে তবু, ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।

—'হাসির গান', সংসার

রবীন্দ্রসাহিত্যেও (বিশেষতঃ খাপছাড়া, প্রহাসিনী, ছড়া প্রভৃতি গ্রন্থে) হাস্যরস-সৃষ্টির সহায়ক মিলপ্রয়োগের প্রচুর নিদর্শন আছে। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করছি।—

এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।…
তাই বসেছি ডেস্‌কে আমার, দিয়েছি চাকরকে,
'কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালী লে আও ধাঁ করকে'।

—'পূরবী', শিলঙের চিঠি

এইজাতীয় মিল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর। কিন্তু যমকপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত (এমন কি, হাস্যরসের প্রয়োজনেও) অতি বিরল। এই বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এই।—

শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুসি
নামজাদা সে 'বর নিয়া',
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে
নামের গুণ 'বর্ণিয়া'।

—'খাপছাড়া', ৪৩

এ রকম পূর্ণ যমকের দৃষ্টান্ত বিরল হলেও রবীন্দ্রসাহিত্যে একপ্রকার অপূর্ণ যমকের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন—

নদীতীরে | বৃন্দাবনে ‖
সনাতন | এক মনে ‖
জপিছেন | নাম,
হেন কালে | দীনবেশে ‖
ব্রাহ্মণ চ : রণে এসে ‖
করিল প্র : ণাম।

—'কথা', স্পর্শমণি

এখানে 'নাম-ণাম' যথার্থ মিল নয়, কেননা এই দুই অংশের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিতে ভিন্নতা নেই, অর্থাৎ এখানে পূর্ণ ধ্বনিসাম্য ঘটেছে। কিন্তু পূর্ণ ধ্বনিসাম্য সত্ত্বেও এটাকে যমকও বলা যায় না, কেননা এই দুই অংশ ভিন্নার্থজ্ঞাপক নয়, বস্তুতঃ এখানে 'ণাম' অংশটার কোনো অর্থই নেই। এরূপ অপূর্ণ যমককে বলা যায় **অর্ধযমক**। এখানে এরকম অর্ধযমকের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।—

হে মোর দুর্ : ভাগা দেশ ‖ যাদের ক : রেছ অপ : মান,
অপমানে | হতে হবে ‖ তাহাদের | সবার স : মান।

—'গীতাঞ্জলি', ১০৮

বন্দীরে | দিয়ে গেছ ‖ মুক্তির | সুধা,
সত্যের | বরমালে ‖ সাজালে ব : সুধা,

—'গীতবিতান' (পূজা), ৬১৩

মালাখানি লয়ে | আপন গলায় ‖
আদরে পরিলা | সতী।
ভক্তি-আবেগে | কবি ভাবে মনে ‖
চেয়ে সেই প্রেম | -পূর্ণ বদনে, ‖
'বাঁধা প'ল এক | মাল্য-বাঁধনে ‖
লক্ষ্মীসরস্ | -স্বতী'॥

—'সোনার তরী', পুরস্কার

বাংলা ছন্দে অন্তঃস্থ য় ও অন্তঃস্থ ব-এর প্রচ্ছন্ন রূপ

অন্ধকারে | 'লুকিয়ে' আপন | মনে
কাহারে তুই | পূজিস সংগো | -পনে।

পূর্বে (পৃ ১৮) বলা হয়েছে যে, উদ্ধৃত অংশের 'লুকিয়ে আপন' পর্বটিতে পাঁচ দল গণনা না করে চার দলই গণনা করতে হবে। কারণ 'লুকিয়ে' শব্দের লিপিরূপ তথা দৃষ্টরূপে তিন দল দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার উচ্চারণরূপে তথা শ্রুতরূপে দুই দলের বেশি নেই। এই অংশটির আবৃত্তির প্রতি

একটু নিবিষ্টভাবে মন দিলেই বোঝা যাবে যে, শব্দটি একটু সংকুচিত হয়ে উচ্চারিত হয় 'লুক্‌য়ে' রূপে। এই শ্রুতরূপটিই গ্রাহ্য, দৃষ্টরূপটি নয়। ছন্দের আলোচনায় দৃষ্টি ও শ্রুতির বিরোধ ঘটলে শ্রুতিই মান্য, দৃষ্টি নয়। অর্থাৎ চক্ষুকর্ণের বিবাদে ছান্দসিকের রায় সর্বদাই যায় কর্ণের পক্ষে ও চক্ষুর বিপক্ষে।

এ প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা, ওই 'লুকিয়ে' শব্দটার মধ্যেই ছন্দতত্ত্বের একটা বিশেষ রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। সে রহস্যটি এই। বাংলা বর্ণমালা থেকে যথার্থ অন্তঃস্থ য় (ya) লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারিত ধ্বনিমালা থেকে হয় নি। তাই আমাদের উচ্চারণে যখনই যথার্থ অন্তঃস্থ য়-র আবির্ভাব হয় তখনই তাকে লিখতে হয় 'ইয়' রূপে। এখানেও তাই হয়েছে। এখানে 'লুকিয়ে' শব্দটির আসল উচ্চারণরূপ হচ্ছে 'লুক্‌য়ে'। এই রহস্যটুকু ধরতে পারলেই বোঝা যাবে এই শব্দের দলসংখ্যা তিন নয়, দুই। তাহলে আলোচ্য দ্বিতীয় পর্বের মাত্রাসংখ্যাও চারই হবে, পাঁচ নয়।

লুকিয়ে লুকিয়ে | আমি
মেয়ের মায়ের | স্বামী,
লুকিয়ে আমি | কবি
তুলে নিলাম | ছবি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, 'আলেখ্য', নূতন মাতা

এখানেও প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে মাত্রাসংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আরও অভ্যাস | দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে | তবলা,
সকল সময় | জ্ঞান থাকে না ‖ তবলা কি | অবলা।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, 'আষাঢ়ে', কেরাণী

এখানেও 'বাজিয়ে-বাজিয়ে' পর্বে চার দলই গণনীয়, ছয় দল নয়।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইয়ে-ভাগান্ত শব্দমাত্রেই যে এরকম হবে তা নয়। যেখানে 'ইয়'র উচ্চারণ 'য়' হবে কেবল সেখানেই ইয়-কে একদল বলে গণ্য করতে হবে, অন্যত্র নয়। যেমন—

প্রিয় নামটি | শিখিয়ে দিত ‖ সাধের সারি | -কারে,
নাচিয়ে দিত | ময়ূরটিরে ‖ কঙ্কণ ঝং | -কারে।
... ...
প্রিয়ে, তোমার | তরুণ আঁখির ‖ প্রসাদ যেচে | যেচে
কালিদাসকে | হারিয়ে দিয়ে ‖ গর্বে বেড়াই | নেচে।

—'ক্ষণিকা', সেকাল

এখানে শিখিয়ে, নাচিয়ে, হারিয়ে, এই তিন শব্দে ইয়=য় হয়েছে। কিন্তু 'প্রিয়ে' ও 'দিয়ে' শব্দে তা হয়নি। প্রিয়ে শব্দের ইয়ে মূল শব্দেরই অঙ্গ, অন্য রকম উচ্চারণ করে শব্দবিকৃতি ঘটানো চলে না। দিয়ে, নিয়ে, গিয়ে প্রভৃতি দ্বিদল ক্রিয়াপদেও সাধারণতঃ ইয়ে-র সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ স্বীকৃত হয় না। ছড়ার ছন্দে অবশ্য তাও চলে প্রয়োজনমতো। যেমন—

ছিপ নিয়ে গেছে | কোলা ব্যাঙে ‖
মাছ নিয়ে গেছে | চিলে।

এখানে নিয়ে-র উচ্চারণরূপ হচ্ছে ন্যে (=ন্য়ে) বা নে। সাহিত্যে এরকম প্রয়োগ চলে না। দিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দিয়েছি, নিয়েছি প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত ইয়ে অংশেরও সংকোচ ঘটে না।

পূর্বে বলেছি লুকিয়ে, শিখিয়ে প্রভৃতি ত্রিদল ক্রিয়াপদেও ইয়ে-র উচ্চারণ-সংকোচ সার্বত্রিক নয়, অর্থাৎ ছন্দের প্রয়োজনে ইয়ে-র অসংকুচিত রূপই স্বীকৃত হয়। যেমন—

আমাকে মা, | যখন তুমি ‖ ঘুম পাড়িয়ে | রাখ,
তখন তুমি | হারিয়ে গিয়ে ‖ তবু হারাও | নাক।

—'শিশু ভোলানাথ', ঘুমতত্ত্ব

এখানে 'পাড়িয়ে' শব্দের ইয়ে-অংশটুকুর অসংকুচিত প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'হারিয়ে' ও 'গিয়ে' সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মন্তব্যের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মনে রাখা প্রয়োজন, শব্দান্তস্থিত ইয়ে-র এই যে অন্তঃস্থ রূপ বা সংকুচিত প্রয়োগ, তা কেবল দলবৃত্ত রীতির ছন্দেই চলে, অমিশ্র বা মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে চলে না।

অন্তঃস্থ য়-এর ন্যায় অন্তঃস্থ ব (=wa) -ও বাংলা বর্ণমালা (তথা লিপিমালা) থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু উচ্চারিত ধ্বনিমালায় তার আসন অব্যাহতই রয়েছে। বাংলা লিপিতেও সে তার কাজ করে চলেছে, কিন্তু ছদ্মবেশে। তাই তাকে সহসা চেনা যায় না। সে ছদ্মরূপটি হচ্ছে 'ওয়্'। যেমন—'হাওয়া' শব্দটির আসল উচ্চারণরূপ হাও্.য়া নয়, আসল রূপ হচ্ছে হা.ওয়া (ha.wa, হ্. বা)। অর্থাৎ 'ওয়া' ধ্বনির মধ্যে অন্তঃস্থ ব লুকিয়ে রয়েছে। তেমনি ওয়ালা (wa. la, বা. লা) কথার 'ওয়া'র মধ্যেই গুপ্ত রয়েছে বাংলা অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি।

বাংলা ছন্দে অন্তঃস্থ য় ও অন্তঃস্থ ব-এর প্রয়োগে একটু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য এই যে, অন্তঃস্থ য়-ধ্বনি প্রচ্ছন্নরূপে (অর্থাৎ ইয়-রূপে) দেখা দেয় শুধু দলবৃত্ত রীতির ছন্দে এবং তাও সব সময় বা সর্বত্র নয়। কিন্তু অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি সব রীতির ছন্দেই সর্বদাই 'কাজ করে যায় গোপনে গোপনে'। যেমন—

১। দলবৃত্ত রীতির ছন্দে

শুনি নাই তো | মানুষের কি | বাণী
মহাকালের | বীণায় বাজে; | আমি কেবল | জানি,
রাঁধার পরে | খাওয়া, আবার | খাওয়ার পরে | রাঁধা—
বাইশ বছর | এক চাকাতেই | বাঁধা।

—'পলাতকা', মুক্তি

ফেরিওয়ালার | ডাক শোনা যায় | গলির ওপার | থেকে—
দূরের ছাদে | ঘুড়ি ওড়ায় | সে কে!
কখন মাঝে | মাঝে
ঘড়িওয়ালা | কোন্ বাড়িতে | ঘণ্টাধ্বনি বাজে!
সামনে বিরাট্ | অজানিত, | সামনে দৃষ্টি | -পেরিয়ে-যাওয়া | দূর
বাজাত কোন্ | ঘর-ভোলানো | সুর।

—'পরিশেষ', বালক

২। কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে

কোন্ সুদূরের | পার হতে আনে | কোন্ সুদূরের | ধন।
ভেসে যেতে চায় | মন,
ফেলে যেতে চায় | এই কিনারায় | সব চাওয়া সব | পাওয়া।

—'গীতাঞ্জলি', ১২

চিরদিবসের | ভুলে-যাওয়া বাণী |
কোন্ কথা মনে | আনে সে,
অনাদি উষার | বন্ধু আমার—
তাকায় আমার | পানে সে।

—'উৎসর্গ', ১৪

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দে

বারেবারে | -ফিরে-যাওয়া ‖ অন্ধকারে | বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে | -ফিরে-আসা | হয়ে।

—'বলাকা', ৪২

বাজা তোরা | বাজা বাঁশি, ‖ মৃদঙ্গ উঠুক তালে | মেতে ‖
দুরন্ত নাচের নেশা | -পাওয়া।
নদীপ্রান্তে | তরুগুলি ‖ ঐ দেখ্ | আছে কান | পেতে, ‖
ঐ সূর্য | চাহে শেষ | চাওয়া।

—'মহুয়া', মিলন

দ্বিতীয় অধ্যায়

পয়ার-পরিচয়

১

রীতি ও প্রকৃতি-ভেদে পয়ারের তিন রূপ
দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত

'পয়ার' একটি ছন্দ-আকৃতির নাম, ছন্দ-প্রকৃতির নাম নয়। যে ছন্দপংক্তির মোট মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ এবং যার আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি, তারই নাম **পয়ার**। সেইজন্যই ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

আট-ছয় আট-ছয়
পয়ারের ছাঁদ কয়।

—ছন্দ-সরস্বতী, 'ভারতী' ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ৫

এই আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ার প্রকৃতিভেদে তিন রকম। যেমন—

১। আপাতত এই আনন্দে | গর্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন | আমি আছি বেঁচে।

—'ক্ষণিকা', সেকাল

২। সূর্য চলেন ধীরে | সন্ন্যাসী-বেশে
পশ্চিম নদীতীরে | সন্ধ্যার দেশে।

—'চিত্রবিচিত্র', তপস্যা

৩। জীবন-মন্থন-বিষ | নিজে করি' পান
অমৃত যা উঠেছিল | করে গেছ দান।

—'চৈতালি', কাব্য

তিনটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে আছে মোট চোদ্দ মাত্রা এবং আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি। সুতরাং তিনটিই পয়ার। কিন্তু শুনতে তিন রকম। অর্থাৎ তিনটি তিন প্রকৃতির পয়ার।

এই শ্রুতিগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ এই যে, তিন দৃষ্টান্তের মাত্রা-সমাবেশের রীতি তিন রকম। এই তিন রীতি যথাক্রমে এই।—

(১) প্রথম দৃষ্টান্তে প্রত্যেকটি সিলেবল্ একমাত্রা বলে গণ্য হয়েছে। প্রত্যেক শব্দের যেসব অংশ বাগ্‌যন্ত্রের এক-এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তাকেই বলা হয় সিলেবল্। বাংলায় তার নাম দিয়েছি **দল**। 'আপাতত' শব্দ চার প্রয়াসে (আ+পা+ত+ত) উচ্চারিত, সুতরাং এটিতে চার দল। 'এই' শব্দ এক প্রয়াসে উচ্চারিত, সুতরাং এটিতে এক দল। 'আনন্দে' শব্দ তিন প্রয়াসে (আ+নন্+দে) উচ্চারিত, সুতরাং এটিতে তিন দল। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে, এই দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে আছে আট+ছয় এই চোদ্দ দলে চোদ্দ মাত্রা। সুতরাং এটিকে বলতে পারি **দলমাত্রিক** বা **দলবৃত্ত** (syllabic) পয়ার।

এই দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম 'স্বরবৃত্ত'। এই ছন্দোরীতির উৎসস্থল লোকসাহিত্য। সুতরাং এটিকে 'লৌকিক' রীতি নামও দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বলা যায় বাংলা 'প্রাকৃত' রীতি।

(২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তিতে আট+ছয় হিসাবে চোদ্দটি দল নেই। সুতরাং এটি দলবৃত্ত রীতির পয়ার নয়। এটির মাত্রাগণনারীতি নিম্নলিখিতরূপ :

'পশ্চিম' শব্দে দুই দল, পশ্+চিম্। দুটি দলেরই শেষে একটি করে আশ্রিত বর্ণ ('শ্ এবং ম্) আছে। এরকম আশ্রিতান্ত দলকে বলি **রুদ্ধদল** (closed syllable)। 'নদীতীরে' শব্দে চার দল, ন+দী+তী+রে। কোনো দলের অন্তেই আশ্রিত বর্ণ নেই। এরকম আশ্রিতহীন দলকে বলি **মুক্তদল** (open syllable)। এই রীতির ছন্দে এক-একটি মুক্তদলের উচ্চারণে যে সময় লাগে, রুদ্ধদলের উচ্চারণে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। একটি মুক্তদলের উচ্চারণকালকে বলি **কলা** (mora)। সুতরাং রুদ্ধদলের উচ্চারণকালের পরিমাণ দুইকলা। 'নদীতীরে' শব্দের চার মুক্তদলে চার কলা (১×৪)। 'পশ্চিম' শব্দের দুই রুদ্ধদলেও চার কলা (২×২)। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে, এই দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে আছে আট+ছয় এই চোদ্দ কলায় চোদ্দ মাত্রা। সুতরাং এটিকে বলতে পারি **কলামাত্রিক** বা **কলাবৃত্ত** (moric) পয়ার।

এই কলামাত্রিক বা কলাবৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম 'মাত্রাবৃত্ত'। রবীন্দ্রনাথের

পরিভাষার অনুসরণে বলা যায় 'সংস্কৃতভাঙা সাধুরীতি'। কেননা, এই রীতির অধিকাংশ ছন্দেরই উৎসস্থল জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের গীতিরচনাগুলি।

(৩) তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতেও প্রতি পংক্তিতে আট+ছয় হিসাবে চোদ্দটি দল নেই। সুতরাং এটি দলবৃত্ত রীতির পয়ার নয়। এটিকে উক্তপ্রকার কলাবৃত্ত রীতির পয়ারও বলা যায় না। কারণ এটির প্রতি পংক্তিতে এই দ্বিতীয় পদ্ধতির গণনায় আট+ছয় হিসাবে চোদ্দটি কলা পাওয়া যায় না। এটির মাত্রাগণনা-রীতি নিম্নলিখিত রূপ:

'জীবন-মন্থন-বিষ নিজে করি পান', এই পংক্তিটিতে মুক্তদল আছে পাঁচটি (জী, নি, জে, ক, রি), রুদ্ধদলও পাঁচটি—একটি (মন্) শব্দের আদিতে, আর চারটি (বন্, থন্, বিষ্, পান্) শব্দের অন্তে। আদিম (initial) রুদ্ধদলটির (মন্) উচ্চারণকাল মুক্তদলের সমান। কিন্তু অন্তিম (final or ultimate) রুদ্ধদলগুলির উচ্চারণকাল মুক্তদলের দ্বিগুণ। সুতরাং পাঁচটি মুক্তদল ও একটি আদিম রুদ্ধদলে পাচ্ছি ছয় কলা, আর চারটি অন্তিম রুদ্ধদলে পাচ্ছি আট কলা— মোট চোদ্দ কলা।

এই চোদ্দ কলার সমাবেশপ্রণালীটা কি তাও দেখা যাক।—

১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২

জীব-ন্ মন্থ-ন্ বি-ষ্ | নিজে করি পা-ন্

দেখা যাচ্ছে এখানেও আট-ছয়ের সমাবেশ। সুতরাং এটাও পয়ার। মন্ ও থন্, এই দুই রুদ্ধদলের উচ্চারণগত পার্থক্যটুকু লক্ষণীয়। মন্ আছে শব্দের আদিতে, সুতরাং এটির উচ্চারণ সংকুচিত ও এককলা-পরিমিত; আর থন্ আছে শব্দের অন্তে, সুতরাং এটির উচ্চারণ প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত। এটাই হচ্ছে এই ছন্দোরীতির সাধারণ নিয়ম।

পূর্বোক্ত কলাবৃত্ত রীতির সঙ্গে এই রীতির একটু পার্থক্য আছে। কলাবৃত্ত রীতিতে সব রুদ্ধদলেরই উচ্চারণকাল মুক্তদলের দ্বিগুণ। কিন্তু এই রীতিতে শুধু অন্তিম রুদ্ধদলের উচ্চারণেই মুক্তদলের দ্বিগুণ সময় লাগে, অন্যবিধ রুদ্ধদলের উচ্চারণকাল মুক্তদলের মতোই এক কলা।

এই দৃষ্টান্তটিতে একটিমাত্র রুদ্ধদলে এই বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশিষ্টতার অধিকতর পরিচয়সূচক দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যেমন—

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২
বঙ্‌কি-ম্ সংকীর্‌ণ পথে | তুর্‌গ-ম্ নির্‌জ-ন্
—'কল্পনা', স্বপ্ন

এখানে তিনটিমাত্র প্রান্তিক (ultimate) রুদ্ধদল (হাইফেন-যোগে চিহ্নিত— কি-ম্, গ-ম্, জ-ন্) দুই কলার মর্যাদা পেয়েছে। পক্ষান্তরে পাঁচটি অপ্রান্তিক (non-ultimate) অর্থাৎ শব্দের আদি- বা মধ্য-স্থিত সব রুদ্ধদলই (বঙ্, সং, কীর্, তুর্, নির্) মুক্তদলের ন্যায় এককলা-পরিমিত। এই হিসাবে এই লাইনটিতেও পাওয়া যাবে আট-ছয়ে চোদ্দ কলা। এই শ্রেণীর পয়ার রুদ্ধদলের দ্বিবিধ (সংকুচিত ও প্রসারিত) রূপের যোগে গঠিত। সুতরাং একে বলতে পারি **মিশ্রকলাবৃত্ত** (mixed moric বা composite) রীতির পয়ার। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এর নাম 'সাধু' রীতির পয়ার।

২

অক্ষরগণনা-রীতির ও অক্ষরবৃত্ত নামের বিচার

প্রচলিত পরিভাষায় তৃতীয় রীতিকে (অর্থাৎ মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিকে) বলা হয় 'অক্ষরবৃত্ত'। এই নামটিকে নির্দোষ বলা যায় না। কারণ 'অক্ষর' শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবহ নয়, যথাযথভাবে উচ্চারণজ্ঞাপকও নয়। যেমন— বাংলা উচ্চারণে 'সঙ্গীত' শব্দটিতে আছে দুটি রুদ্ধদল— সঙ্+গীত্। কিন্তু প্রচলিত অক্ষরগণনার রীতিতে অক্ষর আছে তিন—স+ঙ্গী+ত, অর্থাৎ একটি অযুক্তাক্ষর+একটি যুক্তাক্ষর+একটি হস্ অক্ষর। বলা বাহুল্য আমরা এরকম উচ্চারণ করি না, করতে পারিও না। যদি লেখা হয় 'সংগীত', তাহলে অক্ষরবিন্যাস হবে অন্য রকম— সং+গী+ত্। অর্থাৎ এখানে 'সঙ্গীত'এর দ্বিতীয় যুক্তাক্ষরের স্থলে এল একটি অযুক্তাক্ষর আর প্রথম অযুক্তাক্ষরটিও গেল রূপান্তরিত হয়ে। অথচ সঙ্গীত এবং সংগীত, দুএরই উচ্চারণরূপ এক। প্রচলিত অক্ষরগণনার হিসাবে চশমা, পশমী, রেশমী ও কাশ্মীর শব্দের সমান মূল্য, সব শব্দেই তিন অক্ষর। বলা

বাহুল্য, পশমী ও কাশ্মীর শব্দের উচ্চারণমূল্য অর্থাৎ ধ্বনিপরিমাণ সমান নয়। রেশমী ও রশ্মি শব্দের উচ্চারণমূল্য বা ধ্বনিপরিমাণ সমান অথচ অক্ষরগণনায় রেশমী শব্দকে মূল্য দেওয়া হয় বেশি। তেমনি চক্রী শব্দের থেকে চাকরি শব্দে বেশি অক্ষর ধরা হয়, যদিও এই দুই শব্দের ধ্বনিমূল্যে কোনো পার্থক্য নেই। 'মুস্কিল' শব্দে তিন অক্ষর, অথচ 'মুশকিল' শব্দে চার। উচ্চারণগত দলবিভাগের প্রতি নজর না রেখে লিপিগত অক্ষরসংখ্যার হিসাবে ছন্দ বিচারের মুশকিল এখানেই।

এই মুশকিলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। উঃ একি, মুহুর্মুহু | হানিছে বিদ্যুৎ।

—'রুদ্রচণ্ড', পঞ্চম দৃশ্য

২। উদয়দিগন্তে ঐ | শুভ্র শঙ্খ বাজে।

—'পূরবী', পঁচিশে বৈশাখ

৩। ওপারের গ্রাম দেখো | আছে ঐ চেয়ে।

—'মহুয়া', নববধূ

৪। নদীপ্রান্তে তরুগুলি | ঐ দেখ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।

—'মহুয়া', মিলন

অক্ষরসংখ্যার হিসাবে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই এক মাত্রা কম হয়ে যাবে। কিন্তু উচ্চারণের প্রতি লক্ষ রেখে 'উঃ' এবং 'ঐ' এদুটি অন্তিম রুদ্ধদলে দুই-মাত্রা ধরলে মাত্রার কমতি হবে না।

চতুর্থ দৃষ্টান্তের 'চাওয়া' শব্দে দেখতে তিন অক্ষর, কিন্তু শুনতে দুটি-মাত্র মুক্তদল। কারণ 'চাওয়া' শব্দের 'ওয়া' বাংলায় দুই অক্ষরে লেখা হলেও ওটি স্বরূপতঃ একই অক্ষর। আসলে বাংলা ওয়া = ইংরেজি wa এবং হিন্দি 'বা'। ছন্দের কারবার ধ্বনি নিয়ে। সুতরাং দৃশ্যমান লিপিসংখ্যার হিসাবে তার স্বরূপ ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে শ্রূয়মাণ দলসংখ্যা ও তার পরিমাণের হিসাবে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, বাংলা 'ওয়া' সর্বত্রই (অর্থাৎ সব রীতির ছন্দেই) এক মাত্রা বলে স্বীকার্য। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

রথের চঞ্চল বেগ | হাওয়ায় উড়ায়।

—'মহুয়া', বিদায়

দেখা গেল 'উঃ' এবং 'ঐ' অক্ষরগণনায় এক হলেও উচ্চারণগত ধ্বনিমাত্রায় দুই। আবার 'চাওয়া' 'হাওয়া' অক্ষরগণনায় তিন হলেও উচ্চারণ ও শ্রুতির মাপে দুই।

'ঐ' অক্ষরের হিসাবে এক হলেও উচ্চারণ ও শ্রুতির হিসাবে দুই। কেননা তার শ্রুতিরূপ হচ্ছে 'ওই'। বাংলায় 'ঐ' এবং 'ওই' সর্বদাই পরস্পরের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—

ওই মুখে, ওই চক্ষে | ওই হাসিটিতে।

—'মহুয়া', সৃষ্টিরহস্য

তিন স্থলেই 'ওই' না লিখে 'ঐ' লেখা চলত। তাতে অক্ষরসংখ্যা কমে গেলেও মাত্রাহানি ঘটত না। তেমনি দৈ আর দই, বৌ আর বউ সমমূল্য। দৈ-বৌ লিখলে মাত্রাহানি ঘটে না, দই-বউ লিখলেও মাত্রাবৃদ্ধি হয় না—যদিও এই লিপিপার্থক্যে অক্ষরসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এরকম আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দিনেরে মাভৈঃ বলে | যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।

—'পূরবী', সমাপন

এখানে 'মাভৈঃ' শব্দে তিন মাত্রাই গণনা করতে হবে।

উপরে প্রান্তিক (ultimate) রুদ্ধদলের অক্ষরসংখ্যানিরপেক্ষ দ্বিমাত্রক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখানো হল। এবার অপ্রান্তিক (non-ultimate) রুদ্ধদলের একমাত্রক প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে |
'উৎসুক' ধরণী।

—'মহুয়া', শুভযোগ

২। তাই তব আঁখি দুটি |
নিজেরে কি করিছে 'ভর্ৎসনা'।

—'মহুয়া', দর্পণ

৩। ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে |
উন্মীলিত 'গুলমোরের' থোলো |
—'মহুয়া', অসমাপ্ত

৪। কেননা ছুটাবো তেজে | সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি | দৃঢ় 'বল্‌গা' পাশে।
—'মহুয়া', সবলা

৫। 'অপ্রগল্‌ভা' ধরিত্রী সে | প্রণামে লুন্ঠিতা।
—'মহুয়া', লগ্ন

৬। আমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে-পথ চঞ্চল করে | 'দিগ্‌বালার' অঞ্চলের হাওয়া।
—'মহুয়া', বিরহ

যথাক্রমে এই ছয়টি দৃষ্টান্তের উং, ভর্ং, গুল্‌, বল্‌, গল্‌ ও দিগ্‌, এই ছয়টি অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের উচ্চারণ একমাত্রক বলে স্বীকার্য। উচ্চারণনিরপেক্ষ ভাবে অক্ষরগণনা করলে এসব স্থলে একটি করে বাড়তি অক্ষর পাওয়া যাবে।

অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের এই যে একমাত্রক প্রয়োগ, এটা সাধারণতঃ দেখা যায় অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেই। অ-সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে এরকম অপ্রান্তিক রুদ্ধদল বিকল্পে দ্বিমাত্রকও হয়ে থাকে।

প্রথমে একমাত্রক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। উপরের তৃতীয় দৃষ্টান্তের 'গুলমোর' শব্দটি অ-সংস্কৃত, অথচ 'গুল' দলটা একমাত্রক বলেই গণ্য হয়েছে। সংকলনের শ্রম বাঁচাবার জন্যে এ ধরণের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিজেই রচনা করে দিলাম।—

পশমী শাল গায়ে দিয়ে গেলাম কাশ্মীরে,
রেশমী জামা-গায়ে শেষে আগরা এনু ফিরে।
নাগরার বাহার দেখি কানপুর শহরে,
লখনউ-পুরীর শোভা মন-প্রাণ হরে।
আনমনা হৃদয় লয়ে পাটনা এনু চলে,—
কলকাতা হাতছানি দেয়, চিত্ত মোর দোলে।

কাশ্মীর ভূস্বর্গ বটে, কলকাতা সে মর্ত্যে,—
অপূর্ব মহিমা তার স্বর্গ পারে ধরতে ?

বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্তের রচনাটা গ্রাহ্য নয়, ছন্দটাই বিচার্য। আশা করি ছন্দোদোষ ঘটেনি। পশমী, রেশমী, আগরা প্রভৃতি শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধদলগুলি সবই একমাত্রক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রয়োজন বোধ করলে এগুলিকে দ্বিমাত্রক রূপেও প্রয়োগ করা চলে। যেমন—

'পশমী' চাদর গায়ে গেলাম কাশ্মীরে,
'রেশমী' জড়ায়ে এনু আগরায় ফিরে।

সবটা রচনাকেই এভাবে রূপান্তরিত করা চলত।

অ-সংস্কৃত শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের এই দ্বৈত প্রয়োগের বিষয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আলোচনা করেছেন একাধিক উপলক্ষে। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে বিষয়টা স্পষ্টতর করতে চেষ্টা করছি।—

১। 'টোটকা' এই মুষ্টিযোগ 'লটকানের' ছাল,
'সিঁটকে' মুখ খাবি, জ্বর 'আটকে' যাবে কাল।

২। 'পাতলা' করি কাটো প্রিয়ে 'কাতলা' মাছটিরে,
'টাটকা' তেলে ফেলে দাও 'সরষে' আর জিরে।

৩। কর্ণে দিলা 'ঝুমকা' ফুল, নাসিকায় নথ,—
অঙ্গসজ্জা-সমাধানে ভুরি মেহন্নত।

৪। বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ-লুণ্ঠনে,
শুক্ল রাতি 'ঢাকল' মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে।

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ৬৫-৭৯

সবগুলি দৃষ্টান্তেই অপ্রান্তিক রুদ্ধদল একমাত্রক রূপে গণ্য হয়েছে। প্রয়োজন-মতো একই রুদ্ধদল যে উভয় রূপেই প্রযুক্ত হতে পারে তার দৃষ্টান্তও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন।—

৫। 'চিমনি' ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই 'ঠাকরুন'।

৬। 'চিমনি' ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে 'ঠাকরুন' মোর নাই কোনো দোষ।
—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ৭৭

এই দুই দৃষ্টান্তে 'চিমনি' ও 'ঠাকরুন' শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধদল-দুটির (চিম্, ঠাক্) দ্বিবিধ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

উপরের ছয়টি দৃষ্টান্তই তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত (অর্থাৎ অক্ষরগোনা) রীতির পয়ার ছন্দে রচিত। কিন্তু অক্ষর গুনে হিসাব করলে আট-ছয়ের হিসাব মিলবে না। অথচ কানের বিচারে এগুলিতে কোথাও কোনো খুঁত নেই। সুতরাং স্বীকার করতে হবে অক্ষরগণনার পদ্ধতিটাই ভুল এবং 'অক্ষরবৃত্ত' নামটাও ত্রুটিহীন নয়।

তর্ক উঠতে পারে, এসব স্থলে প্রয়োজনমতো যুক্তাক্ষর (যেমন—পশ্মী, চিম্নি) স্বীকার করে নিলেই অক্ষরসংখ্যার গরমিল ঘুচে যায়, সুতরাং অক্ষরবৃত্ত নামটাও দোষের নয়। কিন্তু 'প্রয়োজনমতো' কথাটার মধ্যেই ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যেমন, পঞ্চম দৃষ্টান্তে 'চিম্নি' ধরে নিয়ে সংকট এড়ানো যায় বটে, কিন্তু 'ঠাকরুন'কে 'ঠাক্রুন' করা চলবে না। পক্ষান্তরে ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে 'ঠাক্রুন' করা চলবে, কিন্তু 'চিম্নি' করা চলবে না। অর্থাৎ যেখানেই রুদ্ধদলের একমাত্রক বা সংকুচিত প্রয়োগ সেখানেই যুক্তাক্ষর মানতে হয়, আর যেখানে দ্বিমাত্রক বা প্রসারিত প্রয়োগ সেখানে যুক্তাক্ষরকে এড়িয়ে চলতে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অক্ষরসংখ্যার সমতা রাখার চেষ্টায় আসলে উচ্চারণ-রূপকেই মেনে নেওয়া হয়। গোড়াতেই যদি রুদ্ধদলের উচ্চারণগত দ্বৈতরূপকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে জোড়াতালি দিয়ে অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখার জন্য গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় না।

এতক্ষণ যা আলোচনা করা গেল তার মূলকথা এই যে, ছন্দনিরূপণের প্রয়োজনে প্রথম কর্তব্য—শব্দের দলবিভাজন (syllabication) করা, অক্ষর-বিভাজন নয় ; অতঃপর দ্বিতীয় কর্তব্য— প্রত্যেক দলের উচ্চারণকাল অনুসারে তার কলাসংখ্যা নির্ণয় করা।

কয়েকটি শব্দ বিশ্লেষণ করে এ কথার তাৎপর্য পরিস্ফুট করছি। প্রথমেই অক্ষরবিভাজন-প্রণালীর দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বরূপ দেখাতে চেষ্টা করি। এই প্রণালীতে এক অক্ষরেই এক মাত্রা। যেমন—

র	বী	ন্দ্র	না	থ্	—	৫ অক্ষরে	৫ মাত্রা
উ	ৎক	ণ্ঠি	ত		—	৪ অক্ষরে	৪ মাত্রা
বি	দ্যু	দ্দী	প্ত		—	৪ অক্ষরে	৪ মাত্রা
উ	চ্ছৃ	ঙ্খ	ল্		—	৪ অক্ষরে	৪ মাত্রা
ছা	ন্দ	সি	ক্		—	৪ অক্ষরে	৪ মাত্রা
প্র	গ	ল্ভ			—	৩ অক্ষরে	৩ মাত্রা
উ	ল্লা	স্			—	৩ অক্ষরে	৩ মাত্রা
প	শ্চা	ৎ			—	৩ অক্ষরে	৩ মাত্রা
গু	ল্ফ				—	২ অক্ষরে	২ মাত্রা
দি	ক্				—	২ অক্ষরে	২ মাত্রা
স	ৎ				—	২ অক্ষরে	২ মাত্রা

এটা হচ্ছে তথাকথিত অক্ষরমাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত রীতির গণনা। কিন্তু এই প্রণালী উচ্চারণসম্মত নয়, সুতরাং শ্রুতিসম্মতও নয়। অতএব স্বীকার্য নয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ প্রণালীতে শব্দমধ্যবর্তী হস্‌বর্ণ পরবর্তী বর্ণের সহিত যুক্ত বলে গণ্য হয়, তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত নয় ; অথচ শব্দান্তিক হস্‌বর্ণ স্বতন্ত্র বলেই গণ্য হয় ও এক মাত্রার মর্যাদা পেয়ে থাকে।

এবার এই রীতির ছন্দে শব্দের দলবিভাজন ও মাত্রানিরূপণ-প্রণালীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই রীতির ছন্দে অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের উচ্চারণ সাধারণতঃ সংকুচিত ও মুক্তদলের ন্যায় এককলা-পরিমিত, আর প্রান্তিক রুদ্ধদলের উচ্চারণ প্রায় সর্বদাই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত। এই প্রণালীতে এক কলায় এক মাত্রা। তাই এই প্রণালীতে সাধারণতঃ প্রতি মুক্তদলে ও প্রতি অপ্রান্তিক রুদ্ধদলে এক মাত্রা ও প্রতি প্রান্তিক রুদ্ধদলে দুই মাত্রা গণনীয়। যেমন—

র	বীন্	দ্র	না-থ্	—	৪ দলে	৫ কলামাত্রা
উৎ	কণ্	ঠি	ত	—	৪ দলে	৪ কলামাত্রা
বিদ্	দ্যুদ্	দীপ্	ত	—	৪ দলে	৪ কলামাত্রা
উচ্	ছৃঙ্	খ-ল্		—	৩ দলে	৪ কলামাত্রা
ছান্	দ	সি-ক্		—	৩ দলে	৪ কলামাত্রা
প্র	গল্	ভ		—	৩ দলে	৩ কলামাত্রা

উল্ লা-স্	—	২ দলে	৩ কলামাত্রা
পশ্ চা-ৎ	—	২ দলে	৩ কলামাত্রা
গুল্ ফ	—	২ দলে	২ কলামাত্রা
দি-ক্	—	১ দলে	২ কলামাত্রা
স-ৎ	—	১ দলে	২ কলামাত্রা

শব্দের প্রান্তস্থিত প্রসারিত দ্বিমাত্রক রুদ্ধদলগুলি হাইফেনচিহ্নিত। আর অপ্রান্তস্থিত সংকুচিত একমাত্রক রুদ্ধদলগুলি হাইফেনহীন।

এটা মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির গণনা। এই প্রণালী উচ্চারণ- ও শ্রুতি-সম্মত। সুতরাং এটাই স্বীকার্য।

উপরের দুই তালিকার গণনাপ্রণালীর তুলনা করে আপাততঃ মনে হতে পারে যে, লিপিগত অক্ষর-গণনা ও উচ্চারণগত কলামাত্রা-গণনা, এই দুই প্রণালীরই শেষ ফল যখন একই তখন অক্ষর-গণনার রীতি বর্জন করবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, সব ক্ষেত্রে দুই গণনারীতির শেষ ফল এক হয় না। সেসব ক্ষেত্রে অক্ষরগণনার রীতি অচল, শ্রুতিগত ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয়ের প্রণালীই তখন একমাত্র আশ্রয়স্থল। যেমন, ঐ, দৈ, হৈ-চৈ, মাভৈঃ, বৌ, পালামৌ, ভাইঐ-ভাইএ, ঢেউএর, চাওয়া, দৈ-ওয়ালা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগস্থলে অক্ষর-গণনার রীতি প্রত্যক্ষতঃই অচল। আর পশমী, চিমনি, ঠাকরুন, হালকা, টুকরো ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত। যাঁরা অক্ষরসংখ্যাকেই এই রীতির ছন্দের ভিত্তি বলে মনে করেন তাঁরা গর্ত, খর্ব, শুক্ল ও প্রান্ত শব্দে বিনাদ্বিধায় দুই মাত্রা ধরে থাকেন, কিন্তু কর্‌ত, ধর্‌ব, ঢুক্‌ল, আন্‌ত প্রভৃতি শব্দে দুই মাত্রা ধরবেন কি তিন মাত্রা ধরবেন ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পর্বত ও কল্পনা শব্দে তিন মাত্রা ধরতে সংশয় হয় না, কিন্তু সরবত ও আলপনা শব্দে চার মাত্রা ধরা হবে কিনা এই সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু অক্ষরসংখ্যার পরিবর্তে রুদ্ধদলের উচ্চারণগত রূপকে এই রীতির ছন্দের ভিত্তি বা মূলনীতি বলে গ্রহণ করে কলামাত্রা গণনা করলে সব সংশয় ও সমস্যার অবসান ঘটে। এই মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই ছন্দোরীতিকে 'অক্ষরবৃত্ত' না বলে নাম দিয়েছি 'মিশ্রকলাবৃত্ত'।

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই এই নূতন নামকরণ ও নূতন বিশ্লেষণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে পেরেছি।

বলা প্রয়োজন যে, মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির মাত্রানিরূপণের মূলনীতিটাই এখানে পরিস্ফুট করার প্রয়াস করা গেল। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ন্যায় মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির মাত্রানিরূপণেও মূলনীতির কিছুকিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং মাত্রানির্ণয়কালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যকবোধে এইসব ব্যতিক্রম ও সমস্যার আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

৩

ছন্দের আকৃতি বা ছন্দোবন্ধ
একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী ও চৌপদী

ছন্দের প্রকৃতিভেদের (অর্থাৎ রীতিভেদের) কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। এখন ছন্দের আকৃতিভেদেরও (মানে বন্ধভেদেরও) একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই বলা হয়েছে, ছন্দের একটি আকৃতিভেদের নাম 'পয়ার', প্রকৃতি-ভেদের নাম নয়। ছন্দপংক্তির আকৃতিভেদ বা বন্ধ (verse-form) নির্ণীত হয় প্রধানতঃ প্রতি পংক্তির অর্ধযতিবিভাগের সংখ্যার দ্বারা। তদনুসারে ছন্দপংক্তি (verse বা metrical line) একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী, এই চার রকম হতে পারে। আধুনিক কালে পঞ্চপদী, ষট্পদী প্রভৃতি বহুপদী বন্ধের প্রচলন নেই। নীচে উক্ত চার রকম বন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

যে ছন্দপংক্তি কোনো অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত নয়, তার নাম **একপদী**। যেমন—

১। দলবৃত্ত একপদী (৮ মাত্রা)

শঙ্খ চিলের সঙ্গে যেচে
পাল্লা দিয়ে মেঘ চলেছে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', পাল্কীর গান

২। কলাবৃত্ত একপদী (৮ মাত্রা)

নিভৃত মর্মতলে
ছন্দের ধারা চলে।

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত একপদী (৮ মাত্রা)

কাঁদে যারা খাদ্যহারা
আমার সন্তান তারা।

—'কথা', নগরলক্ষ্মী

তিন দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে আছে আট মাত্রা। আর পংক্তিগুলি অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত নয়। তাই এগুলি একপদী।

আট মাত্রার একপদীর দৃষ্টান্ত (বিশেষতঃ কলাবৃত্ত রীতির) খুবই বিরল। তার চেয়ে দশ মাত্রার একপদীর প্রয়োগ কিছু বেশি। দশ মাত্রার একপদীর দৃষ্টান্ত এই।—

১। দলবৃত্ত একপদী (১০ মাত্রা)

কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলাম হয়তো খুশি হবে।

—'পূরবী', দান

২। কলাবৃত্ত একপদী (১১ মাত্রা + ১০ মাত্রা)

জানো না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য ?
আমার মাংস যদি খাও,
জাত যাবে, জানো না কি তাও ?

—'চিত্রবিচিত্র', এক ছিল বাঘ

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত একপদী (১০ মাত্রা)

ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা,
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

—'কথা', নগরলক্ষ্মী

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম দুই পংক্তিতে এক কলামাত্রা করে বেশি, অর্থাৎ এগারো মাত্রা আছে। বাকি দুই পংক্তিতে দশ মাত্রা করেই আছে।

যে ছন্দপংক্তি একটিমাত্র অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, তাকে বলি দ্বিপদী। যেমন—

১। দলবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)

(ক) আজ বিকালে কোকিল ডাকে | শুনে মনে লাগে,
বাংলা দেশে ছিলাম যেন | তিন শো বছর আগে।

—'খেয়া', কোকিল

(খ) সেই আমাদের দেশের পদ্ম | তেমনি মধুর হেসে
ফুটেছে, ভাই, অন্য নামে | অন্য সুদূর দেশে।

—'স্ফুলিঙ্গ' (১৩৬৭), ২৪৫

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)

(ক) পূর্ণিমা রাত্রের | জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা | তন্দ্রা হারায়।

—'চিত্রবিচিত্র', উৎসব

(খ) সংসারে জেলে গেলে | যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক, | তারি জয় হোক।
বন্দীরে দিয়ে গেছ | মুক্তির সুধা,
সত্যের বরমালে | সাজালে বসুধা।

—'গীতবিতান', পূজা ৬১৩

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)

(ক) সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে | মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া | সোনার খেয়ালে।

—'স্ফুলিঙ্গ' (১৩৬৭), ২৪৩

(খ) জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে | ঘৃণা করি' তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর | মুক্তি খুঁজিবারে।

—'সোনার তরী', আত্মসমর্পণ

ত্রিবিধ দৃষ্টান্তেরই পংক্তিগুলি একটি করে অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। অতএব এগুলি দ্বিপদী।

বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, উদ্ধৃত ত্রিবিধ দৃষ্টান্তেরই প্রতি পংক্তিতে আছে চোদ্দ মাত্রা, আর ওই চোদ্দ মাত্রা অর্ধযতির দ্বারা আট+ছয় মাত্রায় বিভক্ত। এই

রকম আট-ছয় মাত্রায় বিভক্ত দ্বিপদী বন্ধেরই বিশেষ নাম 'পয়ার'। উপরের ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত তিন রীতির (অতএব তিন প্রকৃতির) পয়ার। এই ত্রিবিধ পয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়েই বর্তমান প্রবন্ধের স্থত্রপাত করা হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, পয়ারের আরও নানারকম রূপভেদ আছে। পরবর্তী চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উপচ্ছেদে পয়ারের রূপভেদের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

বলা বাহুল্য যে, পয়ার দ্বিপদী হলেও দ্বিপদীমাত্রকেই পয়ার বলা যায় না। যেমন—

১। দলবৃত্ত দ্বিপদী (১০+১০ মাত্রা)

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে, |
তাহার 'পরে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো, |
সবার আমি একবয়সী জেনো।

—'ক্ষণিকা', কবির বয়স

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী (১০+৭ মাত্রা)

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে | কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে | বিবশ দশ দিক্।

—'সোনার তরী', স্বপ্নোত্থিতা

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত দ্বিপদী (১০+১০ মাত্রা)

আনন্দময়ীর আগমনে |
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে ;
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে |
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

—'কড়ি ও কোমল', কাঙালিনী

তিনটিই দ্বিপদী, অথচ কোনটিই পয়ার নয়। কারণ পংক্তিগুলি আট-ছয় মাত্রাবিভাগ নিয়ে গঠিত নয়।

যে ছন্দপংক্তি দুই অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত তাকে বলা হয় **ত্রিপদী**। যেমন—

১। দলবৃত্ত ত্রিপদী (৮+৮+৬ মাত্রা)

কে গো চিরজনম ভরে |
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে, |
উঠছে মনে জেগে।
নিত্য-কালের চেনা-শোনা |
করছে আজি আনাগোনা |
নবীন-ঘন মেঘে।

—'উৎসর্গ', ৩৩

২। কলাবৃত্ত ত্রিপদী (৮+৮+১০ মাত্রা)

অঘ্রান হল সারা, |
স্বচ্ছ নদীর ধারা |
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে |
মর্মর তালে তালে |
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

—'চিত্রবিচিত্র', শীত

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত ত্রিপদী (৮+৮+৬ মাত্রা)

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, |
সোনার আঁচল-খসা, |
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল 'পর |
টানি দিল ঝিল্লিস্বর |
ঘন যবনিকা।

—'কল্পনা', অশেষ

তিন দৃষ্টান্তেই পংক্তিগুলি দুটি অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। অতএব ত্রিপদী। প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তের পংক্তিগুলি আট-আট-ছয় মাত্রায় বিভক্ত। কলাবৃত্ত রীতিতে আট-আট-ছয় মাত্রাবিভাগের দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। তাই এখানে

আট-আট-দশ মাত্রাবিভাগের দৃষ্টান্তই উদ্ধৃত হল। এই রীতিতে আট-আট-ছয় মাত্রাবিভাগের দৃষ্টান্ত অনায়াসেই রচনা করা চলে। যেমন—

অঘ্রান হল সারা,
বহিছে নদীর ধারা
কলসংগীতে।
শিরীষের ডালে ডালে
মর্মর তালে তালে
পাতা ঝরে শীতে।

যে ছন্দপংক্তি তিনটি অর্ধযতির দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত তাকে বলা হয় **চৌপদী**। যেমন—

১। দলবৃত্ত চৌপদী (৮+৮+৮+৬ মাত্রা)

দুয়ার জুড়ে কাঙাল-বেশে |
ছায়ার মতো চরণ-দেশে |
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে |
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি |
ভিক্ষা নৈব নৈব।

—'ক্ষণিকা', বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

২। কলাবৃত্ত চৌপদী (৮+৮+৮+৫ মাত্রা)

পথপাশে মল্লিকা | দাঁড়াল আসি,
বাতাসে সুগন্ধের | বাজাল বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে |
উদার আড়ম্বরে |
আসে বর অম্বরে |
ছড়ায়ে হাসি।

—'মহুয়া', স্বয়ম্বর

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত চৌপদী (৮+৮+৮+৬ মাত্রা)

আকাশে অসংখ্য তারা |
চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা |

হৃদয় বিস্ময়ে সারা |
হেরি এক দিঠি,
আর যে আসে না-আসে |
মুক্ত এই মহাকাশে |
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে |
অসীমের চিঠি।

—'মানসী', পত্রের প্রত্যাশা

প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তি এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম দুটি পংক্তি দ্বিপদী। আর প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথম পংক্তি, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের তৃতীয় পংক্তি এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তের দুটি পংক্তিই চৌপদী, কেননা এগুলি তিনটি অর্ধযতির দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তের চৌপদীগুলি আট-আট-আট-ছয় মাত্রা বিভাগে বিভক্ত। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের চৌপদীটির মাত্রাবিভাগ আট-আট-আট-পাঁচ, অর্থাৎ এটির শেষ পদে এক মাত্রা কম আছে।

একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী, এই চারটিই বাংলার প্রধান ছন্দোবন্ধ। তার মধ্যে একপদীর (বিশেষতঃ আট মাত্রার) প্রয়োগ খুবই বিরল, চৌপদীর ব্যবহারও খুব বেশি নয়। ত্রিপদী বন্ধ বহুপ্রযুক্ত হলেও দ্বিপদীর তুলনায় খুবই কম।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর যে দৃষ্টান্তগুলি উপরে দেওয়া গেল, সেগুলিই এই চার বন্ধের একমাত্র রূপ নয়। প্রত্যেক বন্ধেরই বহু রূপভেদ দেখা যায়। এই রূপবৈচিত্র্যের দিক্ থেকেও দ্বিপদীর স্থান সর্বাগ্রে। দ্বিপদী বন্ধের বহু রূপভেদের মধ্যে একটি রূপের নাম 'পয়ার', একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আবার পয়ারেরও বহু রূপভেদ আছে। তা পরে দেখানো হচ্ছে।

৪

দৈর্ঘ্যভেদে পয়ারের দুই রূপ
পয়ার ও মহাপয়ার

আমরা দেখলাম যে, অন্যান্য বন্ধের ন্যায় পয়ারবন্ধও রীতিভেদে ত্রিবিধ—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত। তা ছাড়া পয়ারবন্ধ আয়তন- বা দৈর্ঘ্য-ভেদেও

দ্বিবিধ— হ্রস্ব ও দীর্ঘ। পূর্বোক্ত আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ারই হ্রস্ব পয়ার। এটাই পয়ারবন্ধের সাধারণ রূপ। অর্থাৎ 'পয়ার' বলতে সাধারণতঃ আট-ছয় মাত্রাবিভাগের এই হ্রস্ব পয়ারকেই বোঝায়। কৃত্তিবাস-চণ্ডীদাসের সময় থেকে এই পয়ারই বাংলা সাহিত্যের ছন্দভাণ্ডারে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। আধুনিক কালে রঙ্গলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় পয়ারের একটি দীর্ঘরূপও প্রচলিত হয়েছে। আট-দশ মাত্রাবিভাগ নিয়ে তার পংক্তি গঠিত। ধ্বনিগৌরবে সাধারণ পয়ারের উপরেই তার স্থান। এই নবপ্রবর্তিত দীর্ঘ পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন **মহাপয়ার**। নামটি এই নূতন পয়ারের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও গুরুত্বের পরিচায়ক।

মনে রাখা প্রয়োজন, সাধারণ পয়ারের ন্যায় এই মহাপয়ারও রীতিভেদে ত্রিবিধ— দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত। এই ত্রিবিধ রীতিতে রচিত মহা-পয়ারের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে এই।—

১। দলবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)

ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, | এই এসিয়ায় দাঁড়াও সরে এসে,
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক | -নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে।
ভাবসাধনার এই ভুবনে | এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার | ভক্তমালে নূতন মণি হয়ে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'অভ্র-আবীর', বড়দিনে

২। কলাবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)

কখনো বা ফাগুনের | অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।···
সমুখে অজানা পথ | ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে | যাত্রীর পাত্রটি পূরে
সদয় অতীত কিছু | সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।

—'নবজাতক', শেষবেলা

৩। মিশ্রকলাবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)

পূর্ণ করি মহাকাল, | পূর্ণ করি অনন্ত গগন
নিদ্রামগ্ন মহাদেব | দেখিছেন মহান্ স্বপন।···

তটিনীর কলরব, | লক্ষ নির্ঝরের ঝরঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত, | মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

—'প্রভাতসংগীত', মহাস্বপ্ন

কলাবৃত্ত মহাপয়ারের দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয় এবং শেষ পংক্তি খণ্ডিত, অর্থাৎ এই দুই পংক্তির প্রথম দিকের আট মাত্রার বিভাগটি বর্জিত এবং শেষ দিকের দশ মাত্রার বিভাগটি রক্ষিত হয়েছে।

সাধারণ পয়ারের ন্যায় মহাপয়ারও একটি অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং বলা বাহুল্য, হ্রস্ব পয়ারের ন্যায় মহাপয়ারও দ্বিপদীরই প্রকারভেদ মাত্র।

তিন রীতির সাধারণ পয়ার ও তিন রীতির মহাপয়ার, মোট এই ছয় প্রকার পয়ারের কথা মনে না রাখলে পয়ার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

৫

প্রয়োগভেদে পয়ারের তিন রূপ
অপ্রবহমান, প্রবহমান, মুক্তক

শুধু রীতিভেদ ও দৈর্ঘ্যভেদ (বা আয়তনভেদ) নয়, পয়ারের প্রয়োগভেদের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে একে-একে তিন রীতির পয়ার ও মহাপয়ারের বিভিন্ন প্রয়োগভেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

মিশ্রকলাবৃত্ত পয়ারের প্রয়োগভেদ

আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ার ও আট-দশ মাত্রাবিভাগের মহাপয়ার, এই দুই ক্ষেত্রেই আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও পংক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে। আর থাকে দুই পংক্তির শেষে মিল। এই বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কবির স্বাধীনতা যে কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি বক্তব্যকে দুইপংক্তিব্যাপী করার প্রয়োজনটাও কম বাধা নয়। কোনো বক্তব্যকে দুইপংক্তির চেয়ে দীর্ঘ করার স্বাধীনতা যেমন থাকে না, তার চেয়ে ছোট করার স্বাধীনতাও তেমনি থাকে না। এই বাধাগুলি অপসারণের উদ্দেশ্যে মধুসূদন সাধারণ পয়ারের ক্ষেত্রে অর্ধযতি ও পূর্ণযতি-স্থাপনের বিধানকে অস্বীকার করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনমতো যদৃচ্ছাক্রমে অর্ধযতি ও পূর্ণযতি স্থাপনের

স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন। অধিকন্তু তিনি মিলের বাধাটিও দিলেন তুলে। যতি ও মিলের বন্ধনমুক্ত এই নূতন পয়ারই পরিচিত হয়েছে **অমিত্রাক্ষর** নামে। আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলি 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। মধুসূদন-প্রবর্তিত এই মুক্তযতি ও মুক্তগতি অমিত্রাক্ষর পয়ারের দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তথাপি সম্পূর্ণতার খাতিরে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হল।—

১। অমিল প্রবহমান পয়ার (অমিত্রাক্ষর)

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে— অজেয় জগতে—
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি, যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন),
যবে খরতর শরে গহন কাননে
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি।

—'মেঘনাদবধ কাব্য', আরম্ভাংশ

দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্মিলা মিলিয়া,
স্বর্ণপাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—

ভেদি অভ্র মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

—'মেঘনাদবধ কাব্য', শেষাংশ

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পংক্তিপ্রান্তিক মিলের মাধুর্যটুকু অস্বীকার না করেও এই মুক্তযতি পয়ারের স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে পয়ারকে এক নূতন রূপ দিলেন। এই নূতন পয়ারের নাম দিয়েছি 'সমিল প্রবহমান পয়ার'। মানসী কাব্যের 'মেঘদূত' (১৮৯০) ও 'অহল্যার প্রতি' (১৮৯০) এবং সোনার তরী কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' (১৮৯২) ও 'বসুন্ধরা' (১৮৯৩) কবিতায় এই সমিল মুক্তযতি পয়ার আদর্শ রূপ ধারণ করেছে। এই রচনাগুলি সর্বপরিচিত। তথাপি পাঠকের সহায়তাকল্পে একটি অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।—

২। সমিল প্রবহমান পয়ার

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত ! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরু গুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন

এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

—'মানসী', মেঘদূত (১৮৯০)

আট-দশ মাত্রাবিভাগের মহাপয়ারও রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রবহমান রূপ পেয়েছে। এই প্রবহমান মহাপয়ারও সমিল ও অমিল-ভেদে দ্বিবিধ। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই এই দুই রূপের পূর্ণ পরিণতি। সোনার তরী কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' (১৮৯৩) এবং চিত্রা কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৪) কবিতার যোগে সমিল প্রবহমান মহাপয়ার সকলের কাছেই সুপরিচিত হয়েছে। আর, অমিল প্রবহমান মহাপয়ারের আদর্শ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'প্রান্তিক' কাব্যের (১৯৩৮) কয়েকটি রচনায়। সমিল ও অমিল প্রবহমান মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে এই।—

৩। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

—'সোনার তরী', সমুদ্রের প্রতি (১৮৯৩)

৪। অমিল প্রবহমান মহাপয়ার

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গল ধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল— সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা।

—'প্রান্তিক', ১৭-সংখ্যক কবিতা (১৯৩৭)

'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ' কাব্যে মধুসূদন যতি ও মিলের বন্ধনকে ছিন্ন করে পয়ারকে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু তিনি পয়ারপংক্তির চোদ্দমাত্রার সীমা-বন্ধনটুকুকে মেনেই নিলেন। তেমনি আঠারো মাত্রার প্রবহমান মহাপয়ারের সীমাবন্ধনটুকুও দীর্ঘকাল অব্যাহত রইল। কিন্তু পংক্তিসীমার বন্ধনও বন্ধন, ক্ষেত্রবিশেষে কবিদের অভিপ্রায়সাধনের অন্তরায়। তাই কালক্রমে পয়ারের এই পংক্তিসীমার বন্ধনটুকুও কবিদের হাতে ছিন্ন হল। তার নিদর্শন আছে গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনায় এবং রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায়। যতি ও পংক্তি-সীমার বন্ধনহীন এই যে মুক্ততর পয়ার, তাকেই বলি **মুক্তক**। এই মুক্তকেরও দুই রূপ— সমিল ও অমিল। চোদ্দমাত্রার ছোট পয়ারের অমিল মুক্তক রূপের নিদর্শনস্বরূপ মানসী কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' (১৮৮৭) কবিতাটি স্মরণীয়। ছোট পয়ারের সমিল মুক্তক রূপ দেখিনি। আঠারো মাত্রার মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপ প্রথম দেখা দেয় 'বলাকা' কাব্যে (১৯১৬)। এই কাব্যের 'ছবি,' 'শাজাহান' প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়। মহাপয়ারের অমিল মুক্তক রূপ দেখা দেয়

আরও অনেক কাল পরে—রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কয়েকটি কাব্যে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৫। অমিল মুক্তক (বেড়াভাঙা ছোটো পয়ার)

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও কেড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখ তার সৌন্দর্য-বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

—'মানসী', নিষ্ফল কামনা (১৮৮৭)

৬। সমিল মুক্তক (বেড়াভাঙা মহাপয়ার)

তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত

মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

—'বলাকা', ৬-সংখ্যক কবিতা (১৯১৪)

৭। অমিল মুক্তক (বেড়াভাঙা মহাপয়ার)

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—

প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।
—'জন্মদিনে', ৬-সংখ্যক কবিতা (১৯৪০)

পয়ারের এই যে বন্ধনমুক্তি, তা হচ্ছে শুধু যতি, মিল ও পংক্তিসীমার বন্ধন থেকে মুক্তি, মাত্রাবিন্যাসের নীতিবন্ধন থেকে মুক্তি নয়। মাত্রাবিন্যাসের যে নীতিতে ছন্দোবদ্ধ পদ্যের পদ গঠিত হয়, পয়ারের মুক্তক রূপেও সে নীতির বন্ধনকে মেনে নেওয়াই হয়। মাত্রাবিন্যাসের নীতিকে লঙ্ঘন করলে পদ্য আর পদ্যই থাকে না, সে হয়ে ওঠে গদ্য। কিন্তু কবিরা অনুভব করলেন যে, বিশেষ মাত্রাবিন্যাসব্যবস্থার ফলে পদ্যে যে ধ্বনিগত তরঙ্গায়িত ভঙ্গি বা ধ্বনিস্পন্দ (rhythm) জেগে ওঠে, সেই স্পন্দ বা ধ্বনিভঙ্গিটুকুকে রক্ষা করে যদি নির্দিষ্ট মাত্রাবিন্যাসের বন্ধনকে এড়ানো যায় তাহলে একরকম স্পন্দমান গদ্যের (rhythmic prose) উদ্ভব হয় যাকে ক্ষেত্রবিশেষে অনায়াসেই কাব্যভাবের বাহনরূপে স্বীকার করে নেওয়া যায়। এইরূপেই আবির্ভূত হল গদ্যকবিতা। গদ্যকবিতার এই যে ধ্বনিভঙ্গি বা স্পন্দনলীলা, তাকেই বলা হয়েছে 'গদ্যছন্দ' (prose rhythm)। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আমি বললেম, "সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।"
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, "আচ্ছা, তাই সই।"
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে;
বললে, "তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।"
বলে গলা ধরলে জড়িয়ে।
আমি বললেম, "কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে?"
সে বললে, "অকবির মতো হল তোমার কথাটা;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারিই কণ্ঠে,

হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।"
শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে॥
—'আকাশপ্রদীপ', ময়ূরের দৃষ্টি

পদ্যের রঙ-লাগা গদ্যই হচ্ছে গদ্যকবিতার বাহন। গদ্যেও পদ্যের রঙ লাগে যে কণ্ঠস্বরের প্রভাবে, সে কণ্ঠস্বর বস্তুতঃ ভাবেরই দ্যোতক। এই ভাবাবেগের ফলেই গদ্যকবিতার ভাষা স্পন্দিত হয়ে ওঠে পদ্যের মতো। এইজন্য কবিতার এই ভাবস্পন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। গদ্যকবিতার ভাষায় পদ্যের ন্যায় মাত্রাবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিমাণ রক্ষিত হয় না, কিন্তু তাতে কবিতার ভাবস্পন্দটুকু রক্ষিত হয়। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে কবিতার গদ্যের পার্থক্য এখানেই। যে গদ্যভাষায় পয়ারের পরিণতি সম্পর্কে এই আলোচনা করছি, তার সঙ্গে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটুকুর তুলনা করলে এই পার্থক্য অনায়াসেই ধরা পড়বে।

গদ্যছন্দের কথা এল প্রসঙ্গক্রমে। কিন্তু সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় পয়ারবৈচিত্র্য। অতএব পয়ারপ্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক।

দলবৃত্ত পয়ারের প্রয়োগভেদ

উপরে পয়ারের প্রয়োগভেদের যে সাতটি দৃষ্টান্ত দেখানো হল, সেই সাতটিই মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির বিভিন্ন প্রয়োগভেদ সাহিত্যে সুপ্রচলিত। দলবৃত্ত রীতিতে এত রকম প্রয়োগভেদ সাধারণতঃ দেখা যায় না, যদিও মিশ্রকলাবৃত্তের ন্যায় দলবৃত্ত রীতিতেও সব রকম প্রয়োগ-বৈচিত্র্যই রচনা করা সম্ভব। দলবৃত্ত রীতির এই বৈচিত্র্য-উৎপাদনশক্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সজাগ ছিল। তাঁর রচনায় দলবৃত্ত পয়ারের যে কয় প্রকার প্রয়োগবৈচিত্র্য দেখা যায়, এ স্থলে সে সবকয়টিরই দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১। অমিল প্রবহমান পয়ার (অমিত্রাক্ষর)

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই ; কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে

কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষঃকুলের নিধি।

—'ছন্দ' (১৯৬২), ছন্দের প্রকৃতি, পৃ ১৩১

বলা বাহুল্য, এটুকু হচ্ছে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথমাংশের রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় সাধু অমিত্রাক্ষরের প্রাকৃত রূপ, বর্তমান গ্রন্থে স্বীকৃত পরিভাষায় মিশ্রকলাবৃত্ত অমিত্রাক্ষরের দলবৃত্ত রূপ। মেঘনাদবধের মিশ্রকলাবৃত্ত বা সাধুরীতির অমিত্রাক্ষর শতাব্দীকালের অভ্যাসের ফলে আমাদের বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তাই মেঘনাদের সাধু অমিত্রাক্ষরের প্রাকৃত রূপ দেখলে আমাদের চিরাগত ও বদ্ধমূল সংস্কার স্বভাবতঃই তার প্রতি প্রতিকূল হয়ে ওঠবার আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কার কথা মনে ছিল বলেই ওই অংশটুকু রচনা করবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে ভূমিকা করে বলতে হয়েছিল—

"এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।...এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না"।

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ১৩০-৩১

আর, ওই অংশটুকু রচনা করেও তাঁকে আবার উপসংহারে বলতে হয়েছে, "এতে গাম্ভীর্যের ক্রটি ঘটেছে একথা মানব না"।

অথচ একথাও সত্য যে, অনেক পাঠকের কান রবীন্দ্রনাথের কানের সঙ্গে সায় দিতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এটা দীর্ঘকালের অভ্যাসজাত সংস্কারেরই ফল। চিরন্তন অভ্যাস ও সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারা প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব, সকলের পক্ষে নয়। প্রচলিত পয়ারের চিরন্তন সংস্কারের কঠিন বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে একদা মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভাকেও কম বেগ পেতে হয় নি।

তবে দুঃখের বিষয়, ওই দৃষ্টান্তটুকু ছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে দলবৃত্ত বা প্রাকৃত অমিত্রাক্ষরে রচিত কোনো কবিতা রেখে যান নি। রেখে গেলে প্রাকৃত অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে উক্ত সংস্কারের বাধা অপসারণের সহায়তা হত, বাংলার ছন্দভাণ্ডারেরও একটি নূতন কক্ষ উদ্ঘাটিত হত।

২। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা,
তাদের প্রাণের ঝরনা-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার-ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ু,
নয় সে কেবল দিনরজনীর সাতনলি হার, নয় সে নিশাস-বায়ু।
নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজনবন্ধুজনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনসুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।
একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
বহুদূরে ; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে,—
গর্ভবাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে।

—'পলাতকা', শেষ গান (১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ৪)

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে দলবৃত্ত রীতিতে রচিত সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই আছে। এই রীতির অমিল প্রবহমান মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত একটিও নেই।

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত ছোট পয়ারের সমিল বা অমিল মুক্তক রূপের দৃষ্টান্তও নেই রবীন্দ্রসাহিত্যে। বস্তুতঃ কোনো রীতিতেই ছোট পয়ারের মুক্তকরূপ রচনার প্রয়োজনীয়তাও নেই। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রসাহিত্যে দলবৃত্ত রীতির মহাপয়ারের উভয়বিধ মুক্তকরূপেরই দৃষ্টান্ত আছে যথেষ্ট।—

৩। দলবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপ

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে।

চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নত শিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার ;
ঐ যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
ঐ যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘুমে অলস কায় ;
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে ;
তোমার ঐ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনো কালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করে প্রভু
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

—'বলাকা', ৩২নং কবিতা (১৯১৫)

মিশ্রকলাবৃত্ত মহাপয়ারের ন্যায় দলবৃত্ত মহাপয়ারের মুক্তক রূপও প্রথম দেখা দেয় 'বলাকা' কাব্যেই (১৯১৬)। তবে পরবর্তী 'পলাতকা কাব্যেই (১৯১৮) দলবৃত্ত মহাপয়ারের মুক্তক রূপের সর্বাধিক প্রয়োগ দেখা যায় এবং এই কাব্যের সঙ্গেই দলবৃত্ত মুক্তকের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে সবচেয়ে বেশি। আরও পরবর্তী কালে এই দলবৃত্ত মুক্তক রবীন্দ্রনাথের হাতে অধিকতর শক্তি অর্জন করে। যেমন—

বিরাট্ অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্‌নারে তার অধীর অন্বেষণ।

ঘর হতে ধায় আঙন-পানে, আঙন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে।···
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া।
হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে
অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত-পানে ;
আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা।

—'পরিশেষ', অবুঝ মন (১৯২৭)

বলা বাহুল্য, এটা দলবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপ। এবার এর অমিল রূপের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৪। দলবৃত্ত মহাপয়ারের অমিল মুক্তক রূপ

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন,
গান জাগিয়ে চলো সমুখ-পথে,
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী,
তাদের মাভৈঃ-বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে

নির্মল এই শরৎ-রৌদ্রালোকে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
—'পুনশ্চ', পয়লা আশ্বিন (১৯৩২)

প্রাকৃত বা দলবৃত্ত রীতির ছন্দ কতখানি শক্তিশালী হতে পারে তার অন্যতম প্রমাণ এই রচনাটি।

কলাবৃত্ত পয়ারের প্রয়োগভেদ

কলাবৃত্ত পয়ার বা মহাপয়ারের প্রবহমান বা মুক্তক রূপের প্রয়োগবৈচিত্র্য রবীন্দ্রসাহিত্যে তথা বাংলাসাহিত্যে বিশেষ দেখা যায় না। শুধু কলাবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপের একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আছে 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে। তার থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি এখানে।—

১। কলাবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপ

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে।
অন্তরবিধাতার স্বষ্টিনিদেশে
যে অতীত পরিচিত, সে নূতন বেশে
সাজ-বদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার।
মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে তারা,
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা।
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।
যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি।

এই কথা ধ্রুব জেনে নিভৃতে লুকায়ে
সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে।

—'নবজাতক', শেষ বেলা (১৯৪০)

এই রচনাটির শুধু ভাবগত গভীরতা নয়, এর ছন্দোগত গতিবেগ, শক্তিশালিতা এবং গাম্ভীর্যও লক্ষণীয়। বস্তুতঃ এই রচনাটি কলাবৃত্ত মহাপয়ারের নূতন শক্তি ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে করি।

এস্থলে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন হতে পারে, যে ছন্দোরূপকে নাম দেওয়া হয়েছে 'মুক্তক' তাকে পয়ারের রূপভেদ বলে গণ্য করবার সার্থকতা কি ? 'আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়', পয়ারের এই যে বর্ণনা দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে, যদি একান্তভাবে সে বর্ণনাকেই আঁকড়ে থাকা যায় তবে অমিত্রাক্ষরকেও পয়ার বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ আট-ছয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করার মধ্যেই অমিত্রাক্ষরের অর্থাৎ প্রবহমানতার সার্থকতা। অথচ একথাও সত্য যে, মধুসূদন আট-ছয়ের নিয়ম ভেঙেও পয়ারের চোদ্দমাত্রার রূপটাকে মেনে নিয়েই অমিত্রাক্ষর সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং অমিত্রাক্ষর তথা চোদ্দমাত্রার মমিল প্রবহমান ছন্দও পয়ারের রূপভেদ বলেই স্বীকার্য। আট-দশ মাত্রাবিভাগের ছন্দও (অপ্রবহমান বা প্রবহমান) পয়ারেরই রূপভেদ বলে স্বীকার্য। কারণ কবিরা এটিকে তৈরি করেছেন পয়ারকে একটু দীর্ঘ করে নিয়ে এবং এটিকে প্রয়োগও করেছেন পয়ারের রূপভেদ বলেই। প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ারকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'লাইন-ডিঙোনো' বা 'পংক্তিলঙ্ঘক' পয়ার বা মহাপয়ার। এইজাতীয় পয়ারে বা মহাপয়ারে ছন্দের গতি পংক্তিদৈর্ঘ্যের সীমাটাকে মানে, যদিও সে পংক্তিশেষের যতিটাকে মানে না ; তাই সে পংক্তিসীমার বেড়াটাকে ডিঙিয়েই চলে। তার পরে একসময়ে কবিরা পংক্তিসীমার বেড়াটাকেও দিলেন ভেঙে। কিন্তু সে বেড়াটাও পয়ারেরই (বা মহাপয়ারের) বেড়া। তাই কবি এই মুক্তবন্ধ ছন্দকে পরিচয় দিলেন 'বেড়াভাঙা পয়ার' বলে। কেননা তা পয়ার বা মহাপয়ারেরই মুক্ত রূপ। তাই তার পারিভাষিক নাম হয়েছে 'মুক্তক'। এই মুক্তক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'বলাকা' ও 'পলাতকা' কাব্যের সময় থেকে, যদিও 'মানসী'র নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতেই তার পূর্বাভাস দেখা যায় 'বলাকা' ও 'পলাতকা'য় এই মুক্তকের

দীর্ঘতম পংক্তিসীমা হচ্ছে আঠারো মাত্রা (যদিও ব্যতিক্রম হিসাবে কোনো কোনো স্থলে তার চেয়েও দীর্ঘ পংক্তির ব্যবহার দেখা যায়)। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে মহাপয়ারেরই বেড়াভাঙা রূপ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে কোনো কোনো কবি এই মুক্তক রচনায় বাইশ বা ছাব্বিশ মাত্রার পংক্তিও চালাতে প্রয়াসী হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁরা আট-আট-ছয় বা আট-আট-দশমাত্রার ত্রিপদীবন্ধকেও মুক্তক রূপ দিতে চেষ্টিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রয়াস সফল হয়েছে বলা যায় না এবং ওরকম মুক্তক বন্ধ রচনার কোনো সার্থকতা আছে বলেও মনে হয় না।

৬

পয়ারের রূপবৈচিত্র্য

আমরা দেখলাম রীতিভেদে (দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত), দৈর্ঘ্যভেদে (পয়ার ও মহাপয়ার) ও প্রয়োগভেদে (অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক) পয়ার বহুবিধ। বিশুদ্ধ গাণিতিক হিসাবে তার সংখ্যাটা দাঁড়াবে তিন × দুই × তিন অর্থাৎ আঠারো। তার উপরে সমিল-অমিল রূপের হিসাব করলে সংখ্যাটা আবার দ্বিগুণিত হয়ে দাঁড়াবে ছত্রিশে। হিসাবটা অন্যভাবেও দেখানো যায়। পূর্বে বলা হয়েছে (চতুর্থ উপচ্ছেদের শেষ অংশে) রীতি- ও দৈর্ঘ্য-ভেদে পয়ার ছয় রকম। আবার সমিল-অমিলের হিসাব ধরে পয়ারের প্রয়োগভেদও হয় ছয় রকম। অর্থাৎ ছয় রকম পয়ারের প্রত্যেকটিরই প্রয়োগভেদও ছয় রকম। সুতরাং পয়ারের মোট রূপভেদ দাঁড়ায় ছয় × ছয় অর্থাৎ ছত্রিশ।

পরের পৃষ্ঠায় পয়ারের এই ছত্রিশটি রূপকে বংশলতিকার আকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল। এই লতিকাটির প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই পয়ারের রূপবৈচিত্র্য উপলব্ধি করা সহজ হবে।

কার্যতঃ সাহিত্যে পয়ারের এতগুলি (মোট ছত্রিশ রকম) রূপের প্রয়োগ দেখা যায় না। অর্থাৎ পয়ারের কতকগুলি সম্ভাব্য রূপ কবিদের রচনায় মেলে না। তার মধ্যে কয়েকটি সাহিত্যিক প্রয়োগে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য বলেও মনে হয় না। পক্ষান্তরে কতকগুলি রূপের অধিকতর প্রয়োগে বাংলা ছন্দভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়।

	রীতিভেদে	দৈর্ঘ্যভেদে	প্রয়োগভেদে	
ছন্দোরীতি	দলবৃত্ত[১] (syllabic)	পয়ার (৮+৬ মাত্রা)	অপ্রবহমান / প্রবহমান / মুক্তক	সমিল ও অমিল
		মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)	অপ্রবহমান / প্রবহমান / মুক্তক	সমিল ও অমিল
	কলাবৃত্ত[২] (moric)	পয়ার (৮+৬ মাত্রা)	অপ্রবহমান / প্রবহমান / মুক্তক	সমিল ও অমিল
		মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)	অপ্রবহমান / প্রবহমান / মুক্তক	সমিল ও অমিল
	মিশ্রকলাবৃত্ত[৩] (composite)	পয়ার (৮+৬ মাত্রা)	অপ্রবহমান / প্রবহমান / মুক্তক	সমিল ও অমিল
		মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)	অপ্রবহমান / প্রবহমান / মুক্তক	সমিল ও অমিল

---

১ দলবৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম 'স্বরবৃত্ত'। এই ছন্দোরীতিটাই লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন। তাই একে 'লৌকিক' রীতিও বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বাংলা 'প্রাকৃত' রীতি।

২ কলাবৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম 'মাত্রাবৃত্ত'। এই রীতির রবীন্দ্রকৃত সুস্পষ্ট পারিভাষিক নাম নেই। তিনি এটিকে 'সাধু' রীতির পর্যায়ভুক্ত বলেই মনে করতেন এবং এক স্থলে এটিকে 'সংস্কৃত-ভাঙা' ছন্দ বলে পরিচয় দিয়েছেন ('ছন্দ' ১৯৬২ সং, পৃ ১৩২)।

৩ মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম 'অক্ষরবৃত্ত'। কিন্তু এই নামে এই রীতির স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরিভাষায় এই রীতির নাম 'সাধু'। তবে কোনো কোনো স্থলে তিনি এই রীতির ছন্দকে নাম দিয়েছেন 'পয়ারজাতীয়'। এই নামটাও ভ্রান্তিজনক। এই দুটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় ও সপ্তম উপচ্ছেদে।

এবার পয়ারের এই ছত্রিশটি রূপকে তালিকা-আকারে নীচে সাজিয়ে দেওয়া গেল এবং বিশেষ বিশেষ রূপের প্রসঙ্গে প্রয়োজনমত কিছু মন্তব্যও যুক্ত করা হল। পয়ারের যেসমস্ত সম্ভাব্য রূপের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়, সেগুলিকে তারকাচিহ্নযোগে নির্দিষ্ট করা হল।—

১। দলবৃত্ত পয়ার

১। সমিল অপ্রবহমান— বহুকাল থেকেই সুপ্রচলিত।
*২। অমিল অপ্রবহমান—প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই।
+৩। সমিল প্রবহমান—প্রয়োগ নেই। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা আছে।
৪। অমিল প্রবহমান— রবীন্দ্ররচিত একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম কয়েক পংক্তির রূপান্তর। আরও পরীক্ষা হওয়া উচিত।
*৫। সমিল মুক্তক—প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই।
*৬। অমিল মুক্তক—প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই।

২। দলবৃত্ত মহাপয়ার

১। সমিল অপ্রবহমান—প্রয়োগ আছে। অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে।
*২। অমিল অপ্রবহমান—প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই।
৩। সমিল প্রবহমান— বিরল। রবীন্দ্রসাহিত্যে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে— 'পলাতকা' কাব্যের শেষ কবিতা 'শেষ গান'। এটিই 'পূরবী' কাব্যে গৃহীত হয়েছে প্রথম কবিতা হিসেবে, নাম 'পূরবী'। এই রূপটির অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে।
*৪। অমিল প্রবহমান—প্রয়োগ নেই। বোধ করি প্রয়োজনীয়তাও নেই।
৫। সমিল মুক্তক— যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। 'বলাকা'ও 'পলাতকা' কাব্যেই এর প্রথম প্রয়োগ।
৬। অমিল মুক্তক— বিরল। কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে 'পুনশ্চ' কাব্যে। অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ আছে।

৩। কলাবৃত্ত পয়ার

১। সমিল অপ্রবহমান—বেশি প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রথম প্রয়োগ মানসী কাব্যের 'নিস্ফল উপহার' কবিতায়। পরবর্তী কালে 'চিত্রবিচিত্র' কাব্যের কয়েকটি রচনায় এই রূপটির পুনঃপ্রয়োগ দেখা দেয় বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ প্রচুর।

*২। অমিল অপ্রবহমান
*৩। সমিল প্রবহমান
*৪। অমিল প্রবহমান
*৫। সমিল মুক্তক
*৬। অমিল মুক্তক

— প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই।

৪। কলাবৃত্ত মহাপয়ার

+১। সমিল অপ্রবহমান—প্রয়োগ নেই। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ আছে।

*২। অমিল অপ্রবহমান
*৩। সমিল প্রবহমান
*৪। অমিল প্রবহমান

— প্রয়োগ নেই। বোধ করি প্রয়োজনীয়তাও নেই।

৫ সমিল মুক্তক—বিরল। 'নবজাতক' কাব্যের 'শেষ বেলা' কবিতাটিতে এই রূপের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। অধিকতর প্রয়োগে বাংলা ছন্দসম্পদবৃদ্ধির সহায়তা হবে বলে মনে হয়।

+৬। অমিল মুক্তক—প্রয়োগ নেই। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

৫। মিশ্রকলাবৃত্ত পয়ার

১। সমিল অপ্রবহমান—এটাই পয়ারের প্রধানতম ও সর্বাধিক-প্রচলিত রূপ।

২। অমিল অপ্রবহমান—এই রূপের কিছু দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। যেমন—

সেথায় কপোতবধূ লতার আড়ালে
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
তার শান্ত নিশাকালে নিশ্বাসপতনে
প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।

—'প্রভাতসংগীত', সম্মিলন

এরকম অমিল অপ্রবহমান পয়ার রচনার বিশেষ সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

৩। সমিল প্রবহমান—'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় প্রথম প্রযুক্ত। নবপ্রবর্তিত হলেও অধুনা সুপ্রচলিত।

৪। অমিল প্রবহমান—'অমিত্রাক্ষর' নামে সুপরিচিত। এর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত।

*৫। সমিল মুক্তক—প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই।

৬। অমিল মুক্তক—এই রূপের একমাত্র দৃষ্টান্ত 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি। অধিকতর প্রয়োগ অনাবশ্যক।

৬। মিশ্রকলাবৃত্ত মহাপয়ার

১। সমিল অপ্রবহমান—কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮) এর প্রথম প্রয়োগ। 'প্রভাতসংগীত' কাব্যের 'মহাস্বপ্ন' কবিতাটিতে পয়ারের এই রূপটির ধারাবাহিক প্রয়োগ দেখা যায়। এরকম ধারাবাহিক প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। সাধারণতঃ অন্যান্য বন্ধের সহযোগী হিসাবেই এর প্রয়োগ দেখা যায়।

*২। অমিল অপ্রবহমান—প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই।

৩। সমিল প্রবহমান—রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের

প্রতি' কবিতাটিতে এর নিদর্শন মেলে। যথাস্থানে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। অধুনা সুপ্রচলিত।

৪। অমিল প্রবহমান—'প্রান্তিক' (১৯৩৮) কাব্যের কয়েকটি রচনায় এই রূপের খুব বলিষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। আর কোথাও এই রূপের প্রয়োগ দেখা যায় না।

৫। সমিল মুক্তক—রবীন্দ্রকথিত 'বেড়াভাঙা মহাপয়ার'। 'বলাকা' কাব্যে এর প্রথম প্রবর্তন। যথাস্থানে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে।

৬। অমিল মুক্তক—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে', রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের এই তিনখানি কাব্যের কিছুকিছু রচনায় এই রূপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মুখ্যতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই তালিকা করা গেল। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, পয়ারের ছত্রিশ রকম সম্ভাব্য রূপের মধ্যে আঠারো রকমেরই প্রচলন নেই।

উপরে পয়ারের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে যেসমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করা হল তার থেকে সহজেই এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়।—

(১) পূর্বেই বলা হয়েছে, এই তালিকার তারকাচিহ্নিত বৈচিত্র্যগুলির প্রচলন করবার কোনো সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে আঠারো রকম সম্ভাব্য অথচ অপ্রচলিত পয়ারবৈচিত্র্যের মধ্যে পনেরো রকম বৈচিত্র্যেরই কোনো প্রয়োজন নেই। বাকি তিন রকম পয়ারের প্রচলন করা যায় কিনা কবিসমাজ তা ভেবে দেখতে পারেন। এগুলিকে যথাস্থানে + এই সংযোগচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হল।

(২) কলাবৃত্ত রীতিতে সমিল (অপ্রবহমান) পয়ারের অধিকতর প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই রীতির সমিল (অপ্রবহমান) মহাপয়ার বাংলায় নেই। এই অভাব পূর্ণ হলে বাংলার ছন্দভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হবে।

(৩) মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির অমিল অপ্রবহমান পয়ারের কিছুকিছু দৃষ্টান্ত বাংলায় আছে। না থাকলেও কোনো ক্ষতি হত বলে মনে হয় না।

(৪) দলবৃত্ত পয়ারের অমিল বা সমিল প্রবহমান রূপের প্রচলন নেই বাংলা সাহিত্যে। অথচ এরকম রচনাও যে সম্ভব, তার প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর

'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে ('ছন্দ' ১৯৬২ সং, পৃ ১৩১) মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম কয়েকটি লাইনকে দলবৃত্ত রীতির অমিত্রাক্ষরে (অর্থাৎ অমিল প্রবহমান বন্ধে) রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে বা অন্য কেউ স্বাধীনভাবে এ পথে অগ্রসর হননি। অথচ দলবৃত্ত পয়ারের সমিল ও অমিল প্রবহমান রূপের দ্বারা বাংলার ছন্দসম্পদ্ বাড়বে বলেই মনে হয়। বাংলা ছন্দের শক্তিপরীক্ষার পক্ষে এখানে একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে।

দলবৃত্ত রীতির মহাপয়ারের পক্ষেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য, বরং অধিকতর প্রযোজ্য। এই রীতির সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে। এ দিকেও কবিদের নজর পড়া বাঞ্ছনীয়। তাঁরা দলবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার এই উভয় বন্ধেই সনেট রচনা করে পরীক্ষায় অগ্রসর হতে পারেন।

বস্তুতঃ শুধু পয়ার নয়, সকল রকম বন্ধ রচনাতেই মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির সঙ্গে সর্বতোভাবেই সমকক্ষতা করবার ক্ষমতা দলবৃত্ত রীতির আছে, একথা মনে করার সংগত কারণ আছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে বলেছেন—

"এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস। ···এই প্রাকৃত-বাংলাতে 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ১৩০-৩১

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ লঘুভাবে এই উক্তি করেননি। এই উক্তি তিনি করেছেন তাঁর সুচিন্তিততম ছন্দপ্রবন্ধে এবং তিনি সেটি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ করেছিলেন সেখানকার অধ্যাপকরূপে। প্রাকৃত রীতির (অর্থাৎ দলবৃত্ত রীতির) ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এমন জোর দিয়ে এমন দুঃসাহসিক উক্তি করা সম্ভব হয়েছে, যা সাধারণ বুদ্ধিতে অত্যন্ত অবাস্তব ও অসাধ্য বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছন্দপ্রবন্ধের (১৮৮৩) একটি উক্তিও স্মরণীয়।—

"যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ১৭১

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রাকৃত (অর্থাৎ দলবৃত্ত) রীতির ছন্দকেই তিনি বলেছেন 'রামপ্রসাদের ছন্দ'। আর এই ছন্দকে তিনি বারবারই বাংলার 'স্বাভাবিক ছন্দ' বলে বর্ণনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে শেষ বক্তব্য এই যে, দলবৃত্ত রীতির পয়ারবন্ধ যখন মিশ্রকলাবৃত্তের সমকক্ষতা লাভ করবে তখনই বাংলা ছন্দ আপন স্বভাবে ও শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে করি।

৭

'পয়ার' নামের অপপ্রয়োগ

উপরে পয়ারবন্ধের অপূর্ণতার যে তালিকা দেওয়া গেল, তাতে দেখা যায় মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির পয়ার ও মহাপয়ারের অপূর্ণতাই সবচেয়ে কম। অর্থাৎ এই রীতির বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশি। কোনো কালে দলবৃত্ত রীতির পয়ার হয়তো এই মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পয়ার-বৈচিত্র্য রচনায় এই রীতিরই প্রাধান্য চলছে। তাই অনেক সময় মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিটাই পয়ারের একমাত্র রীতি বলে বিভ্রান্তি ঘটে। ইদানীংকালে এই বিভ্রান্তির খুবই প্রসার ঘটেছে। মনে হয় তার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের শিথিল পরিভাষাপ্রয়োগ এবং এই ভ্রান্তির পক্ষে বুদ্ধদেব বসুর নিঃসন্দিগ্ধ ও প্রবল সমর্থন।[১] সুতরাং এস্থলে পয়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের অভিমতের একটু আলোচনা প্রয়োজন।

পয়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় যে শৈথিল্য ও দ্ব্যর্থতা দেখা যায়, বুদ্ধদেবও তা লক্ষ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি এই।—

"পয়ার শব্দটি ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথে এক-এক সময় এক-এক রকম।

---

১ রবীন্দ্রনাথের শিথিল পরিভাষাপ্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যাবে 'ছন্দ' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২)। আর এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের সমর্থন প্রথম প্রকাশ পায় 'কবিতা' পত্রিকায় (১৩৫২ চৈত্র) 'বাংলা ছন্দ'-নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি পরবর্তী কালে কিছু সংশোধিত আকারে সংকলিত হয় 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে (১৩৬১ বৈশাখ)। বর্তমান আলোচনায় বুদ্ধদেবের বিভিন্ন উক্তি ঐ গ্রন্থ থেকেই সংকলিত হল।

অধিকাংশ সময় তিনি চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পয়ার বলতে ত্রিপদীর মতো একটা ছন্দোবন্ধ বুঝেছেন— যাকে বলে ভর্স-ফর্ম।"

—'সাহিত্যচর্চা', বাংলা ছন্দ (৩য় বিভাগ)

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পয়ার যে একটি ছন্দোবন্ধ বা ভর্স-ফর্মের নাম এই 'চিরাচরিত ধারণা'কেই রবীন্দ্রনাথ 'অধিকাংশ সময়' স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা বুদ্ধদেবের দৃষ্টি এড়ায়নি। অথচ তিনি বিশেষ জোর দিয়ে জানালেন—

(১) "পাঠককে হয়তো বলে দেয়া দরকার যে, পয়ার বলতে আমি একটা ছন্দ বুঝি, আর ত্রিপদী বলতে পয়ারের একটা ছন্দোবন্ধ।…পয়ার আসলে একটা ছন্দ, ছন্দের একটা জাত।"

(২) "ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি যে, পয়ার বলতে একটা ছন্দোবন্ধ আর বোঝায় না, বোঝায় ছন্দের একটা জাত।"

—'সাহিত্যচর্চা', বাংলা ছন্দ (৩য় ও ৪র্থ বিভাগ)

ছন্দের রীতিকেই বুদ্ধদেব অভিহিত করেছেন 'ছন্দের জাত' বলে। দ্বিতীয় উক্তির 'আর' শব্দটাও লক্ষণীয়। শত শত বৎসর যাবৎ বাংলার কবিসমাজ একটা বিশেষ ছন্দোবন্ধকেই পয়ার নামে চালিয়ে আসছেন (এটাই হচ্ছে বুদ্ধদেব-কথিত 'চিরাচরিত ধারণা'র উৎপত্তির হেতু) এবং রবীন্দ্রনাথও 'অধিকাংশ সময়' এটাই মেনে নিয়েছেন। তথাপি বুদ্ধদেবের মনে কেমন করে তাঁর 'ছেলেবেলা থেকে'ই একটা বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হল এবং কোন্ যুক্তিতে তিনি এই ছন্দোবন্ধের নামটিকে একটা 'ছন্দের জাত'-এর নামরূপে প্রয়োগ করলেন তা বোঝা গেল না। তিনি কোনো রকম যুক্তি দেখাতেও চেষ্টিত হন নি।

'পয়ার' যদি একটা বন্ধবিশেষের নাম না হয়ে ছন্দের একটা জাতের নাম বলেই স্বীকৃত হয় আর ত্রিপদীকে যদি পয়ার ছন্দের একটা বিশেষ বন্ধ বলেই গণ্য করা হয়, তাহলে যে বিশেষ ছন্দোবন্ধটা (আট-ছয় মাত্রাবিভাগ নিয়ে গঠিত) চিরকাল পয়ার নামে চলে আসছে তাকে তিনি কোন্ নূতন নামে অভিহিত করবেন ? এ বিষয়েও বুদ্ধদেব নীরব।

পয়ার যে একটা ছন্দোবন্ধের নাম, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এটা সব সময়ই মেনে নিয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।—

"পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতি।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত, পৃ ৭১

অর্থাৎ যে ছন্দোবন্ধের প্রতি পংক্তিতে আট মাত্রার পরে এক যতি এবং ছয় মাত্রার পরে আর-এক যতি, তারই নাম 'পয়ার'। পয়ারের এই পরিচয়টা রবীন্দ্রনাথ কখনও অস্বীকার করেন নি। 'কখনও' কথাটা লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের আর-একটা উক্তি এই।—

"আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে।"

—পূর্ববৎ, পৃ ৬৯

এর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, পয়ার শব্দটিকে তিনি একটি ছন্দোবন্ধের নাম রূপেই গ্রহণ করেছেন। এই যে দীর্ঘ পয়ার, তাকে কখনও বলেছেন 'মহাপয়ার', কখনও বলেছেন 'বড়ো পয়ার'। আর আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ারকে বলেছেন 'ছোটো পয়ার'।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'পয়ার' শব্দটি কোনো কোনো স্থলে (সর্বত্র নয়) অন্য অর্থেও ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ারজাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।"

—পূর্ববৎ, পৃ ৬৭

'এই প্রবন্ধে' কথাটি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ 'পয়ার' কথাটিকে স্থলবিশেষে একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অথচ বুদ্ধদেব সে অর্থটিকেই সার্বত্রিক রূপে গ্রহণ করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ যে অর্থটিকে 'অধিকাংশ সময়' মেনে নিয়েছেন, তিনি সেটিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার কথাটিকে একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো স্থানে পয়ার মানে ছন্দের বন্ধবিশেষ, আবার অন্যত্র পয়ার মানে ছন্দের রীতিবিশেষ। কোন্ বন্ধকে পয়ার বলা হয় তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। কোন্ রীতিকে তিনি স্থলবিশেষে 'পয়ার' নাম দিয়েছেন,

তাও বোঝা দরকার। পূর্বোক্ত 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে তুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই তুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি তুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ৭৯

এটা জানা কথা যে, সাধু বাংলা ও চলতি বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলা নামে অভিহিত করতেন। তাঁর মতে তুই ভাষারীতির ন্যায় ছন্দেরও তুই 'রীতি'— সংস্কৃত-বাংলার ছন্দোরীতি ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দোরীতি। প্রথমোক্তকে তিনি অনেক সময় বলতেন 'সাধু ছন্দ', অর্থাৎ সাধু রীতির ছন্দ। এই সাধু ছন্দোরীতিকেই তিনি স্থলবিশেষে পয়ার, পয়ারজাতীয় বা পয়ারশ্রেণীয় নামও দিয়েছেন।

তিন রীতিতেই যে পয়ারবন্ধ রচনা করা চলে, এ বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর উক্তি থেকেই একথা সপ্রমাণ হবে। যেমন—

"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

নিম্নে, স্বচ্ছ এবং ঊর্ধ্বে, এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ১৮১

বলা বাহুল্য, এই অংশটুকুর ছন্দোরীতি কলাবৃত্ত। আর বন্ধ হিসাবে এটি যে পয়ার, তা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত উক্তিতেই সুস্পষ্ট। সুতরাং এটি হচ্ছে 'কলাবৃত্ত পয়ার'।

দলবৃত্ত পয়ারের কথাও আছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে। যেমন—

"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এটা পয়ার, কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে।"

—পূর্ববৎ, পৃ ১৪৩

এটা প্রচলিত প্রথার অক্ষরবৃত্ত পয়ার নয়, অর্থাৎ রবীন্দ্রকথিত সাধু রীতির

পয়ার নয়। কেননা এটার পংক্তিগুলি চোদ্দ 'অক্ষরে'র ভিত্তিতে গঠিত নয়। আসলে এটা দলসংখ্যাসাপেক্ষ। সুতরাং একে বলা যায় অক্ষরসংখ্যানিরপেক্ষ দলবৃত্ত রীতির পয়ার, রবীন্দ্রপরিভাষায় 'প্রাকৃত' রীতির পয়ার।

দলবৃত্ত বা প্রাকৃত রীতির মহাপয়ারের কথাও পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে।—

"চলতি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেছি।...

> এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান-গাওয়া এই ভাষায় ;
> তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাতের আশায়।

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে। কিন্তু এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ১৮৮-৮৯

এটা যে 'আঠারো অক্ষরে গাঁথা' সাধু রীতির মহাপয়ার নয়, তা রবীন্দ্রনাথের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, এটা আঠারো অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। আসলে এটা অক্ষরসংখ্যানিরপেক্ষ দলবৃত্ত রীতির মহাপয়ার। রবীন্দ্র-পরিভাষায় বলা যায় 'প্রাকৃত' রীতির মহাপয়ার। এর প্রতি পংক্তিতে আছে আঠারোটি দলের (অর্থাৎ সিলেবল্-এর) আসন।

বলা প্রয়োজন যে, এখানে উক্ত কবিতাটির শেষ দুই পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে। সমগ্র কবিতাটি আসলে রচিত হয়েছে দলবৃত্ত রীতির সমিল প্রবহমান মহাপয়ার বন্ধে।

আর, চোদ্দ ও আঠারো 'অক্ষরে' গাঁথা পয়ার ও মহাপয়ারের বহু দৃষ্টান্তই আছে 'ছন্দ' গ্রন্থের নানা স্থানে। যেমন—

(১) উন্মত্ত যমুনা বহে আবর্তিত জল
দুর্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল।

(২) বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হল অরণ্যের তলে
যেন অশ্রুসিক্তচক্ষু দিগ্‌বধূর গলিত কজ্জলে।

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ১২৩ ও ১২১

এ দুটো হল যথাক্রমে অক্ষরগোনা পয়ার ও মহাপয়ার, রবীন্দ্রপরিভাষায়

সাধু রীতির, আর বর্তমান প্রবন্ধের পরিভাষায় মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির, পয়ার ও মহাপয়ার।

উক্ত সাধু ও প্রাকৃত রীতির পয়ারের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

"চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম 'নিষ্ফল প্রয়াস'। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য় 'পলাতকা'য়।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), পৃ ১৫৭

উক্ত কবিতাটির নাম বস্তুতঃ 'নিষ্ফল প্রয়াস' নয়, 'নিষ্ফল কামনা'।

এই প্রবন্ধে যে ছন্দোবন্ধকে 'মুক্তক' নামে অভিহিত করেছি, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'গণ্ডিভাঙা বা বেড়াভাঙা পয়ার'। রবীন্দ্রসাহিত্যে চোদ্দ মাত্রার ছোটো পয়ারের মুক্তক রূপের দৃষ্টান্ত একমাত্র উক্ত 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতেই পাওয়া যায়। 'বলাকা' কাব্যে যে পয়ারের বেড়াভাঙা বা মুক্তক রূপ দেখা যায় সে হচ্ছে আঠারো মাত্রার মহাপয়ার, চোদ্দ মাত্রার ছোটো পয়ার নয়। আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'বলাকা' ও 'পলাতকা' কাব্যের উদ্দিষ্ট কবিতাগুলি যথাক্রমে মিশ্রকলাবৃত্ত (তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত) ও দলবৃত্ত (অর্থাৎ লৌকিক) রীতির ছন্দে রচিত হওয়া সত্ত্বেও উভয়প্রকার রচনার সম্বন্ধেই 'পয়ার' শব্দটি প্রয়োগ করতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ তিনি জানতেন 'পয়ার' ছন্দোবন্ধেরই নাম, ছন্দোরীতির নয়।

কিন্তু বুদ্ধদেব একনিষ্ঠভাবে পয়ারকে ছন্দোরীতির নাম বলে ধরে নিয়েছেন। তাই "বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য় 'পলাতকা'য়", এ কথাকে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'অসতর্ক মুহূর্তে'র উক্তি বলেই মনে করেছেন। কেননা, তাঁর মতে "বলাকা প্রধানত পয়ারে লেখা এবং পলাতকা আদ্যন্ত স্বরবৃত্তে"। ('সাহিত্যচর্চা', বাংলা ছন্দ, তৃতীয় বিভাগ, পৃ ১৩১)। বুদ্ধদেবের ভাষায় বলতে গেলে তিনিও তাঁর অনেক উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মতোই "মল্লিনাথমণ্ডলীর খাটুনি বাড়িয়ে দিয়েছেন"।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথ 'অধিকাংশ সময়'ই পয়ার শব্দটিকে ছন্দোবন্ধের নাম হিসাবেই গ্রহণ করেছেন এবং কখনও কখনও এ শব্দটিকে তিনি ছন্দোরীতির পরিচায়করূপে প্রয়োগ করেছেন।

বলা বাহুল্য, একই ছন্দোরীতিকে দুই নাম, অর্থাৎ কখনও 'সাধু' এবং কখনও 'পয়ার' নাম দেওয়া যেমন সমীচীন নয়, তেমনি 'পয়ার' শব্দটিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে, কখনও ছন্দোবন্ধ অর্থে এবং কখনও ছন্দোরীতি অর্থে প্রয়োগ করাও সমীচীন নয়। কিন্তু এই দ্ব্যর্থকতাদোষ সত্ত্বেও প্রসঙ্গভেদে রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না, যদিও তাতে অনেক সময় ভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব, 'পয়ার' শব্দের দ্বারা ছন্দোরীতিকেই বোঝায়, ছন্দোবন্ধকে নয়— অতি প্রবলভাবে এই মত ঘোষণা করে উক্ত ভ্রান্তিকেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছেন।

৮

পারিভাষিক শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ

আবার রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরে আসা যাক। তাঁর রচনায় শুধু 'পয়ার' শব্দ নয়, অন্যান্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগেও কিছু কিছু শিথিলতা ও দ্ব্যর্থকতা দেখা যায়। এখানে ওরকম আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।

অক্ষর

পয়ার ও মহাপয়ার বন্ধের পরিচয়জ্ঞাপক যে দুটি উক্তি তাঁর রচনা থেকে পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, তিনি 'অক্ষর'-সংখ্যার দ্বারাই এই দুই ছন্দোবন্ধের স্বরূপনির্ণয় করেছেন। (এটাই দীর্ঘকালের প্রথা। এইজন্যই 'অক্ষরবৃত্ত' নামটা এত সহজে স্বীকৃতিলাভ করতে পেরেছে।) অথচ অক্ষর-সংখ্যার দ্বারা যে ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, নির্ণয় করা যায় শুধু ধ্বনিপরিমাণের দ্বারা, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই সচেতন ছিলেন। তার প্রমাণ এই।—

"আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র।...অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো বিড়ম্বনা।"

—'ছন্দ' (১৯৬২), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত, পৃ ৬১

'অক্ষরবৃত্ত' নামটিকে লক্ষ্য করেই এখানে 'আক্ষরিক' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

অক্ষর ধ্বনির চিহ্ন বটে, কিন্তু পূর্ণপরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন নয়। সেইজন্য বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই অক্ষর ছন্দের নির্ণায়ক বলে গণ্য হতে পারে না। দৃশ্যমান অক্ষর বা বর্ণ যদি শ্রূয়মাণ ধ্বনির পূর্ণপরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন অর্থাৎ পূর্ণ-প্রতিরূপ বা প্রতীক হত, তাহলে অক্ষরের সহায়তায় ধ্বনির (অতএব ছন্দেরও) পরিমাপ করা অসম্ভব হত না। কিন্তু কোনো ভাষাতেই লিপিবদ্ধ অক্ষর ধ্বনির পূর্ণপ্রতিরূপ নয়। এইজন্যই অভিধানে শব্দের বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে তার উচ্চারণরূপ দেখাবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং লিপিবদ্ধ অক্ষরের দ্বারা যে ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, এবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এইজন্যই বর্তমান লেখকের পক্ষেও 'অক্ষরবৃত্ত' নামের বদলে অন্য নাম এবং অক্ষরগণনার রীতির বদলে ধ্বনিমাত্রাগণনার রীতি গ্রহণ করতে হয়েছে।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধে ছন্দনিরূপণের ক্ষেত্রে অক্ষরের হিসাব সম্বন্ধে এরকম কঠোর মন্তব্য করলেন সেই প্রবন্ধেই তিনি পয়ার ও মহাপয়ারের পরিচয় দিতে গিয়ে 'অক্ষর'-সংখ্যারই হিসাব দিয়েছেন।

পদ

মহাপয়ারের রবীন্দ্রকৃত যে বর্ণনাটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে ব্যবহৃত 'পদ' কথাটিও একটি পারিভাষিক শব্দ। এই শব্দটি বাংলাসাহিত্যে বহুকাল যাবৎ দুই অর্থ বহন করে আসছে। সুতরাং এ শব্দটিরও একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। 'পদ' শব্দের একটা প্রচলিত অর্থ ছন্দপংক্তি (verse, metrical line)। যেমন সনেট অর্থে 'চতুর্দশপদী'। 'পদ' শব্দের আর-এক অর্থ 'অর্ধযতি'র (medial pause) দ্বারা খণ্ডিত ছন্দপংক্তির অংশ (verse clause)। যেমন, দ্বিপদী বলতে বোঝায় সে-রকম ছন্দপংক্তি যা অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে খণ্ডিত। তেমনি ত্রিপদী ও চৌপদী মানে যথাক্রমে তিন ভাগে ও চার ভাগে খণ্ডিত ছন্দপংক্তি। 'পদ' শব্দ একই কালে পূর্ণ পংক্তি ও পংক্তির খণ্ড, দুই-ই বোঝাতে পারে না। তাতে শুধু যে স্ববিরোধিতা ঘটে তা নয়, অনেক সময় তা হাস্যকরও হতে পারে। যেমন— পয়ারের প্রত্যেক 'পদ'ই দ্বিপদী, এধরণের উক্তি। সুতরাং ছন্দের পরিভাষায় পদ শব্দের এক অর্থকে মেনে নিয়ে অপর অর্থকে বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি পারিভাষিক

শব্দ দীর্ঘকাল-প্রচলিত। এগুলি বর্জন করে ছন্দের আলোচনা সহজ নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সুতরাং পংক্তি অর্থে 'পদ' শব্দ ব্যবহার না করাই যুক্তিসংগত। 'পংক্তি' শব্দটাকেই যদি পারিভাষিক অর্থে স্বীকার করে নেওয়া যায় তা হলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ ছন্দের দীর্ঘতম বিভাগ অর্থাৎ পূর্ণযতির বিভাগ বোঝাতে 'পংক্তি' শব্দের ব্যবহার বাংলাসাহিত্যে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেক সময়ই পংক্তি অর্থে 'পদ' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, যেমন মহাপয়ারের পরিচয়প্রসঙ্গে। আবার যখন ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন তখন পরোক্ষে পদ শব্দের 'খণ্ড' অর্থই স্বীকার করে নেন। এরকম দ্ব্যর্থকতা ও অন্যবিধ শিথিলতা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনায় বহুস্থলেই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী, সৃষ্টির দিকেই তাঁর অন্তরের প্রবণতা, বিশ্লেষণের দিকে নয়। তাঁর কাছে সুনির্দিষ্ট ও তর্কাতীত পরিভাষাপ্রয়োগ, বিজ্ঞানসুলভ সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ ও প্রণালীবদ্ধ ধারাবাহিক আলোচনা প্রত্যাশা করা যায় না; এরকম প্রত্যাশা শুধু যে অনুচিত তা নয়, তাতে তাঁর প্রতি অবিচার করাও হয়। এই উক্তি বুদ্ধদেবের সম্বন্ধেও সমভাবে না হলেও বহুলাংশেই প্রযোজ্য। নতুবা তাঁকেও তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিভাষা-পরিচয়

১

সূচনা

বাংলা ভাষাকে জ্ঞানবিজ্ঞানে ও জাতীয়জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যতই ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে, তার পারিভাষিক দৈন্য ততই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই কিছুকাল যাবৎ এই দৈন্য মোচন করে বাংলা ভাষাকে সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট প্রকাশক্ষম করে তোলবার একটা উদ্যম দেখা দিয়েছে। বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানশিক্ষার বাহন করবার প্রয়োজন হওয়াতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় অগ্রণী হন। ফলে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষার অভাব অনেকাংশে দূর হয়েছে। ইদানীং বাংলাকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহারের কথা উঠতেই বাংলায় সরকারি পরিভাষা রচনার জন্য প্রাদেশিক সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ইতিমধ্যেই একাধিক খণ্ড পরিভাষাপুস্তক প্রকাশ করেছেন। তাতে স্বভাবতঃই সকলে সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে বাংলা তথা ভারতীয় পরিভাষা রচনার পথ যে অনেকটা সরল হয়ে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু বিজ্ঞান-আলোচনা ও সরকারি কাজের উপযোগী পরিভাষা নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার উপযোগী পরিভাষা রচনারও প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে কিছুকিছু পরিভাষা রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা ভাষাতত্ত্ব আলোচনার উপযোগী বহু পারিভাষিক শব্দ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত অধিকাংশ পরিভাষাই বর্তমানে স্বীকৃত ও সুপ্রচলিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপভাবে পরিভাষা রচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা ছন্দের বিচারবিশ্লেষণে ব্যাপৃত আছি। ছন্দ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ লিখি ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে। প্রায় এক বছর পরে সেটি

প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৩২৯ পৌষ-চৈত্র, ১৩৩০ বৈশাখ)। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বিষয়ের আলোচনা চলছে। এই দীর্ঘকালের আলোচনায় মতের বিবর্তন ঘটা অনিবার্য। অধিকতর সন্ধান এবং সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের ফলে বহুবারই স্বমতের অল্পবিস্তর পরিবর্তন করতে হয়েছে। শুধু ছন্দের নীতিবিচারে নয়, পরিভাষাব্যবহারেও এই পরিবর্তন ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে রচিত বহুসংখ্যক প্রবন্ধের প্রতি রচনাকাল-অনুসারে লক্ষ করলে ছন্দবিশ্লেষণ ও পরিভাষাব্যবহারে মতের ক্রমবিবর্তন অনায়াসেই ধরা পড়বে। "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" বইখানিতে (১৩৫২) ছন্দোনীতি সম্বন্ধে আমার তৎকালীন শেষ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু অনাবশ্যকবোধে ওই গ্রন্থে পারিভাষিক শব্দের যাথার্থ্য বিচারে বেশি অগ্রসর হইনি এবং অধিকাংশ স্থলে পূর্বব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহার করেছি। ওই গ্রন্থ প্রকাশকালেই আমি একখানি ছন্দ-ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম এবং তাতে প্রকৃষ্টতর অর্থাৎ অধিকতর অর্থবোধক ও ভ্রান্তিনিরোধক পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করি। এই পুস্তকে আমি বহুলাংশে নূতন এক শ্রেণীর পরিভাষা ব্যবহার করেছি। "বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র" নামে একটি প্রবন্ধে (শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৫২, পৃ ১৫৩) এই নূতন পরিভাষার আংশিক পরিচয় দিয়েছিলাম। সে প্রবন্ধে উক্ত ছন্দব্যাকরণখানি 'অচিরপ্রকাশিতব্য' বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে সেটি এখনও প্রকাশিত হতে পারেনি। বর্তমান প্রসঙ্গে ওই পরিভাষাগুলিরই একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টিত হব। বলা বাহুল্য, যেসব পরিভাষাকে অসার্থক, দ্ব্যর্থবোধক ও ভ্রান্তিজনক বলে বোধ করেছি কেবল সেগুলির স্থলে নূতন শব্দ ব্যবহার করা সংগত মনে করেছি। এই অধ্যায়ে সেগুলির বিশেষ পরিচয় দিতে ও তার প্রয়োজনীয়তা দেখাতে চেষ্টা করব।

এখন পর্যন্ত বাংলাছন্দ-বিষয়ক নয়খানি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। যেসব বই মূলতঃ ছাত্রসহায়ক হিসাবে লিখিত সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যেসব পুস্তকে বাংলা ছন্দের স্বরূপনিরূপণের মৌলিক প্রয়াস আছে, এই তালিকায় কেবল সেগুলিরই নাম উল্লিখিত হল।—

১। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ);

২। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৩৩৯ শ্রাবণ);

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ (১৩৪৩ আষাঢ়);
৪। দিলীপকুমার রায়—ছান্দসিকী (১৩৪৭ বৈশাখ);
৫। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৩৫২ আষাঢ়);
৬। মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২ শ্রাবণ);
৭। তারাপদ ভট্টাচার্য—ছন্দোবিজ্ঞান (১৩৫৫ ভাদ্র);
৮। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য—বাংলা ছন্দ (১৩৬২ দোলপূর্ণিমা);
৯। নীলরতন সেন—আধুনিক বাংলা ছন্দ (১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ)।

প্রথম বইখানি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮)। পরবর্তী কালে এটি প্রায় সর্বাংশেই স্থান পায় 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের (১৩৫২) বিভিন্ন অধ্যায়ে। দ্বিতীয়খানিও একটি পুস্তিকা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২+পরিশিষ্ট ২০)। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে (বাং ১৩৪৬। ইং ১৯৪০) অনেকগুলি নূতন অধ্যায় যুক্ত করে এটিকে পরিবর্ধিত রূপ (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৯) দেওয়া হয়। তৃতীয় বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে (১৩৬৯ কার্তিক) বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় এটিতে অনেক নূতন প্রবন্ধ, চিঠিপত্র এবং বহু টীকা ও বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় সংযুক্ত হয়; ফলে গ্রন্থের আয়তনও (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫৪) বহুল-পরিমাণে বর্ধিত হয়।

পরিভাষাপ্রয়োগে ও ছন্দের বিশ্লেষণে গ্রন্থকারদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দশাস্ত্র এখনও সর্বস্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট প্রণালীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। শুধু তাই নয়; পরিভাষাপ্রয়োগের বিভিন্নতার জন্যে ছান্দসিকগণের মতবাদ স্বরূপতঃ প্রকাশ পাবার সুযোগ পায় না, বরং তাঁদের মতপার্থক্যই অতিরঞ্জিত হবার অবকাশ পায়। আর তার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে ছন্দ বিষয়টা ক্রমেই শুধু দুর্বোধ্য নয়, রীতিমত আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু বাংলা ছন্দশাস্ত্রেরই নয়, ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রেরও ওই একই অবস্থা। বিখ্যাত ছান্দসিক জর্জ সেন্টস্‌বারি ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"The great difficulty attending the study of English prosody, and the cause of the fact that no book hitherto published can be said to possess actual authority on the subject, arises from the other fact that *no general agreement*

exists, or ever has existed, *on the root-principles of the matter*, or, it may be added, *on its terminology ;* whence it results that there is no subject on which it is so difficult to write without being constantly misunderstood.
বক্রলিপি লেখকের।

—*Manual af English Prosody (1930), p. 6 & f. n. 1*

এই উক্তি বাংলা ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধেও সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। এতদিনের প্রাচীন ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের অবস্থাই যখন এরকম, তখন অর্বাচীন বাংলা ছন্দ-আলোচনা যে এখনও মতপার্থক্য কাটিয়ে উঠে সর্বস্বীকৃত পরিভাষা ও বিশ্লেষণের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, সেটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। বাংলা ছন্দের আলোচনা যদি সুপরিচালিত হয় তবে অদূর ভবিষ্যতেই তা মতভেদ তথা দুর্বোধ্যতার অপবাদমুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করবে, এ আশা করা অন্যায় নয়। এ বিষয়ে মতভেদের অন্যতম প্রধান কারণ পারিভাষিক শব্দের অর্থগত অনির্দিষ্টতা তথা দ্ব্যর্থকতা। এই দ্বিবিধ ত্রুটির নিরসনপ্রয়াসই বর্তমান আলোচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

২

সংজ্ঞানিরূপণ

এখানে আমার প্রযুক্ত বা স্বীকৃত পরিভাষাগুলির সমীচীনতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা গেল। শব্দগুলিকে বর্ণানুক্রমে না সাজিয়ে যথাসম্ভব বিষয়ানুক্রমে সাজানো হল, যাতে অর্থগত সংগতি রক্ষা করে এগুলিকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা সহজ হয় এবং যাতে তার থেকেই ছন্দের মূলনীতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে।

ছন্দ (Metre)—'ছন্দ' কথাটার অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। এর একটি সাধারণ অর্থ হচ্ছে গড়ন বা ভঙ্গি। যেমন— মুখের ছন্দ, চলার ছন্দ ; "পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে"। কিন্তু ছন্দশাস্ত্রে এটি প্রসঙ্গভেদে অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—

১। পদ্যরচনার বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি। যেমন— বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ,

মাত্রাবৃত্ত বা মাত্রাচ্ছন্দ, গণচ্ছন্দ। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ ছন্দোরীতিকেই অনেক সময় শুধু ছন্দ বলে পরিচিত করা হয়। যেমন, মাত্রাবৃত্ত 'রীতি' না বলে বলি মাত্রাবৃত্ত 'ছন্দ'।

২। কোনো ঘটনার নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুনরাবৃত্তি। যেমন— হৃৎপিণ্ডের ছন্দ ; ঘড়ির দোলকের ছন্দ ; "সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের···নামা-উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে"।

"দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল।"

—'সোনার তরী', পুরস্কার

এই বিশেষ অর্থের জন্য ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে, rhythm। এই রিদম্ই ছন্দের প্রাণ। গুরুলঘু বা প্রস্বরিত-অপ্রস্বরিত ভেদে ধ্বনির পুনরাবর্তন না ঘটলে কোনো ছন্দই অনুভূত হত না। সত্যেন্দ্রনাথ রিদম্ কথাটার বাংলা করেছিলেন 'ছন্দস্পন্দ'। ছন্দের আলোচনায় শুধু 'স্পন্দ' বলাই যথেষ্ট মনে করি। তাতে শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করার সুবিধা হয়। যেমন— তূণকীয় স্পন্দ (trochaic rhythm)। Rhythmic prose-এর বাংলা করা যায় 'স্পন্দমান গদ্য'।

অনেক সময় ছন্দ শব্দটি এই স্পন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন— চতুর্মাত্রিক 'ছন্দ' মানে চার মাত্রার রিদম্ বা 'স্পন্দ'-বিভাগযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি।

৩। পদ্যরচনার বাহ্য আকৃতি। যেমন— পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্রাক্ষর। পদ্যরচনার বাহ্য আকৃতির বিশেষ নাম হচ্ছে 'ছন্দোবন্ধ' বা শুধু 'বন্ধ'। কোনো বিশেষ ছন্দোবন্ধকেও আমরা বলি ছন্দ। যেমন পয়ার 'বন্ধ', অমিত্রাক্ষর 'বন্ধ' না বলে আমরা অনেক সময় বলি পয়ার 'ছন্দ', অমিত্রাক্ষর 'ছন্দ'।

বস্তুতঃ ছন্দ শব্দটি সংকীর্ণার্থে রীতি, স্পন্দ ও বন্ধ, এই তিনের যে-কোনো একটিকে বোঝাতে পারে। ব্যাপকার্থে ছন্দ বলতে ওই তিনের সমষ্টিকেই বোঝায়। এটাই তার আসল অর্থ। তাই ছন্দের আলোচনায় ওই তিনেরই পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং ছন্দ শব্দটিকে সংকীর্ণার্থে ব্যবহার না করে তার স্থলে তার বিশেষার্থবোধক প্রতিশব্দটি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে অনেক

ভ্রান্তিনিরসনের সুবিধা হয়। যেমন— বর্ণবৃত্ত রীতি, আয়াম্‌বিক স্পন্দ, ত্রিপদী বন্ধ।

ইংরেজিতে metre শব্দটিও দ্ব্যর্থকতাহীন নয়। ব্যাপকার্থে metre বলতে ব্যাপকার্থের ছন্দ বোঝায়। সংকীর্ণার্থে 'মিটার' মানে বিশেষ ধরণের স্পন্দযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি। যেমন— আয়াম্‌বিক মিটার।

স্পন্দ (Rhythm)— বিশেষ প্রণালীতে ধ্বনিসমাবেশের পুনরাবৃত্তি। স্পন্দ মুখ্যতঃ দ্বিবিধ, পর্বগত স্পন্দ (foot rhythm) ও পংক্তিগত স্পন্দ (verse rhythm)। আয়াম্‌বিক স্পন্দ, পাঁচ মাত্রার স্পন্দ ইত্যাদি পর্বগত এবং মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতির স্পন্দ পংক্তিগত।

গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই স্পন্দ থাকে। তবে পদ্যের স্পন্দ সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ; তার স্পন্দবিভাগ পরিমিত এবং অনেক স্থলেই তা একই পর্যায়ে পুনরাবৃত্ত হয়। রচনাভেদে গদ্যে স্পন্দের তারতম্য ঘটে। যে গদ্যের স্পন্দ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ও বিশেষভাবে অনুভূত হয় তাকে বলা যায় 'স্পন্দমান গদ্য'। আধুনিক কালে এরকম গদ্যও কবিতার বাহন বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই কাব্যবাহন গদ্যের স্পন্দবিভাগও নিয়মিত বা পরিমিত নয় এবং একই পর্যায়ে তার পুনরাবৃত্তিও ঘটে না।

তাল— সংগীতে তাল স্পন্দজ্ঞাপক ; কিন্তু তা পর্বগত নয়, পংক্তিগত। যেমন কাওয়ালি তাল বললে শুধু চার মাত্রার স্পন্দবিভাগই বোঝায় না, ওরকম চার বিভাগযুক্ত ষোলমাত্রার সমষ্টিকেও বোঝায়।

লয় (Tempo)— অনেকে রিদম্‌ অর্থে 'লয়' শব্দের ব্যবহার করেন। কিন্তু লয় রিদম্‌ নয়। গানের আদ্যোপান্ত কালগতির সমতা রক্ষার নাম 'লয়'। দ্রুতমধ্যবিলম্বিতভেদে লয় ত্রিবিধ। সুতরাং অন্য অর্থে শব্দটির ব্যবহার সংগত নয়।

বৃত্ত— বৃত্ত শব্দের একটি অর্থ ছন্দ। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ অক্ষরছন্দকেই বিশেষভাবে বৃত্ত নামে অভিহিত করেছেন। 'বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ', 'একদেশস্থিতা জাতির্বৃত্তং গুরুলঘুস্থিতম্‌' প্রভৃতি উক্তিতেই প্রকাশ 'জাতি'-বর্গীয় ছন্দসমূহ সাধারণতঃ বৃত্ত নামে পরিচিত ছিল না। পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রেও গণচ্ছন্দ এবং মাত্রাচ্ছন্দকে বৃত্তবহির্ভূত বলেই গণ্য করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রন্থে মাত্রাচ্ছন্দকে 'মাত্রাবৃত্ত' এবং অক্ষরচ্ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত'ও

বলা হয়ে থাকে। তাতে বোঝা যায়, বৃত্ত শব্দটিকে অনেক সময় ছন্দ অর্থেও গ্রহণ করা হত। আপ্তের অভিধানে বৃত্ত শব্দের মানে দেওয়া হয়েছে—'*a metre in general*, especially a metre regulated by the number of syllables (opp. জাতি)'। বক্রলিপি লেখকের।

বৃত্ত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে যা আবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য, ছন্দের প্রধান ধর্মই হল পুনরাবর্তন। ইংরেজি verse শব্দের অর্থও তাই। এর মূল হচ্ছে লাটিন versum=turned back, অর্থাৎ বৃত্ত। লাটিন versum এসেছে vertere ধাতু থেকে। এই ধাতুটি অনিবার্যরূপেই সংস্কৃত বৃৎ ধাতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনিঅর উইলিঅম্‌সের অভিধানেও 'বৃত্ত' শব্দের একটি মানে দেওয়া হয়েছে 'turn of a line, verse'। মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি অক্ষরচ্ছন্দের এক-এক পংক্তির পরেই নির্দিষ্ট ধ্বনিবিন্যাসের পুনরাবর্তন ঘটে। সুতরাং এই শ্রেণীর ছন্দকেই বৃত্ত নাম দেওয়া সমীচীন। বলা প্রয়োজন যে, ইংরেজি verse শব্দের একাধিক অর্থ আছে। এক অর্থ ছন্দোবদ্ধ রচনা অর্থাৎ পদ্য, দ্বিতীয় অর্থ পদ্যপংক্তি, তৃতীয় অর্থ পদ্যের পংক্তিগুচ্ছ বা 'শ্লোক'। বৃত্ত শব্দকে verse-এর দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন।

পৈঙ্গল ছন্দঃসূত্রের ভাষ্যকার হলায়ুধভট্ট বলেন, 'গায়ত্র্যাদৌ ছন্দসি বর্ততে ইতি বৃত্তম্'। এই উক্তি থেকে দুটি বিষয় অনুমান করা যায়। এক, গায়ত্রী প্রভৃতি অক্ষরচ্ছন্দই বৃত্তবর্গের অন্তর্গত। দুই, হলায়ুধের মতে 'বৃত্ত' ছন্দের প্রতিশব্দ নয়। সুতরাং তাঁর মতে মাত্রাচ্ছন্দ বৃত্ত নয়। আর অক্ষরসংখ্যাত ছন্দই যখন 'বৃত্ত', তখন 'অক্ষরবৃত্ত' শব্দটিও সিদ্ধ নয়। অথচ প্রাচীন সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত নাম সুপরিচিত। মনে হয় মাত্রায়াং বর্ততে ইতি মাত্রাবৃত্তম্, এভাবে গ্রহণ করাই প্রাচীনদের অভিপ্রেত ছিল।

রীতি বা পদ্ধতি (Style, Mode)— পদ্যরচনার মূলনীতিগত বিভিন্নতাকে বলা যায় রীতি বা পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতীয় ছন্দ বৈদিক ও লৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। সমস্ত বৈদিক ছন্দই অক্ষরবৃত্ত। অর্থাৎ সমস্ত বৈদিক ছন্দই অক্ষরসংখ্যার সমতাগত মূলনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। লৌকিক ছন্দসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের মূলনীতি অক্ষরসংখ্যার (তথা লঘুগুরুভেদে ধ্বনিবিন্যাসের) সমতা, এগুলিকে বলা হয় অক্ষরচ্ছন্দ বা 'বৃত্ত'। অপর ভাগের মূলনীতি মাত্রাসংখ্যার সমতা, এগুলির সাধারণ নাম মাত্রাচ্ছন্দ বা 'জাতি'। অক্ষরচ্ছন্দ এবং মাত্রাচ্ছন্দ

যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত নামেও পরিচিত। এই মূলনীতিগত পার্থক্য অনুসারে বলা যায় সংস্কৃত (তথা প্রাকৃত) ছন্দরচনার দুই রীতি, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। হলায়ুধ আবার দ্বিতীয় রীতির অন্তর্গত ছন্দসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন, মাত্রাচ্ছন্দ ও গণচ্ছন্দ। গণচ্ছন্দকে 'গণবৃত্ত'ও বলা হয় (মনিঅর উইলিঅম্‌সের অভিধানে metre শব্দ দ্রষ্টব্য)। যা হক, এই হিসাবে সংস্কৃত ছন্দের তিন রীতি— অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও গণবৃত্ত।

বাংলায় বিভিন্ন ছন্দপদ্ধতির কথা প্রথম স্বীকৃত হয় সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)। তিনি বাংলায় অন্ততঃ পাঁচ রকম পদ্ধতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু পদ্ধতিগুলির নামকরণ করেননি। অতঃপর আমি এ বিষয়ে আলোচনা করি (প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ-চৈত্র, ১৩৩০ বৈশাখ)। আমি রচনারীতির পার্থক্য অনুসারে বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করি এবং তাদের নাম দিই যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। প্রথম দুটি নাম আমি প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র থেকে গ্রহণ করি, তৃতীয় নামটি আমার রচিত। এই নামগুলি বাংলায় বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং অনেক সুধী ব্যক্তিও এগুলিকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই তিনটি নামের একটিও সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। কেননা, অক্ষর, মাত্রা ও স্বর, এই তিনটির কোনোটিই সম্পূর্ণরূপে দ্ব্যর্থকতাহীন নয়, প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু ভ্রান্তধারণার অবকাশ আছে। তারই ফলে বাংলা ছন্দ নিয়ে অনেক বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে এবং এখনও তার অবসান ঘটেনি।

অনেক দিন যাবৎই আমি এই নামগুলির ত্রুটির কথা অনুভব করছি এবং কিছু সংশোধনেরও চেষ্টা করেছি। অবশেষে এই তিনটি নামই বর্জন করে নূতন নাম দিয়েছি— সরল কলামাত্রিক, মিশ্র কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক। যথাস্থানে এই নূতন নামকরণের সার্থকতা দেখাতে চেষ্টা করব।

বন্ধ (Metrical form)— ছন্দের রীতি হচ্ছে তার অন্তঃপ্রকৃতির পরিচায়ক, এই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মাত্রাগণনানীতির দ্বারা। আর ছন্দের বন্ধ হচ্ছে তার বাহ্য আকৃতির পরিচায়ক, এই আকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মাত্রা- পর্ব- ও পদ- সমাবেশপ্রণালীর দ্বারা। বন্ধরচনায় মাত্রা- ও পর্ব-সমাবেশের চেয়ে পদসমাবেশেরই প্রাধান্য। কেননা পদবন্ধ রচনারই নাম 'পদ্য'। 'ছন্দোবন্ধ' বলতে প্রধানতঃ পদসমাবেশকেই বোঝায়। তাই ছন্দের বন্ধগুলির নামকরণ

হয়েছে প্রতিপংক্তির অন্তর্গত পদসংখ্যার দ্বারা। বাংলা ছন্দের প্রধান বন্ধ হচ্ছে তিনটি— দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী। এগুলি আবার হ্রস্বদীর্ঘতার তারতম্যভেদে অনেক রকম। দ্বিপদীবিশেষরই নাম 'পয়ার'। পয়ার যে আসলে দ্বিপদী, একথা বহু পূর্বেই লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে (নবম সং, পৃ ৮৯) স্বীকৃত হয়েছে। এই দ্বিপদী পয়ার আধুনিক কালে দুই রূপ নিয়েছে— যতিপ্রান্তিক (endstopped) এবং প্রবহমান (enjambed)। বাংলায় প্রবহমানতার প্রবর্তক মধুসূদন। তাঁর প্রবর্তিত অমিল প্রবহমান দ্বিপদী পয়ারবন্ধই 'অমিত্রাক্ষর' নামে পরিচিত।

অক্ষর—এই দ্ব্যর্থক শব্দটি বাংলা ছন্দের আলোচনায় অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এ শব্দটির একটু বিশদ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানে আছে, "অক্ষর— বর্ণ, letter। syllable"। এর থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।— (১) অক্ষর শব্দের এক মানে বর্ণ ও বর্ণের ইংরেজি letter ; (২) অক্ষর শব্দের আর-এক মানে সিলেব্‌ল্ এবং সিলেব্‌ল্-এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই। মনিঅর উইলিঅম্‌সের অভিধানেও আছে, "অক্ষর— a syllable, a letter"। বস্তুতঃ প্রাচীন ও আধুনিক সব অভিধানেই অক্ষর শব্দের এই দুই অর্থ পাওয়া যায়। বিখ্যাত বাচস্পত্য অভিধানে আছে অক্ষর শব্দের অর্থ "অকারাদিবর্ণে", আবার বর্ণ শব্দের অর্থ "অকারাদ্যক্ষরে"। সুতরাং অক্ষর ও বর্ণ যে পরস্পরের প্রতিশব্দ তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, এই অভিধানেই অক্ষর শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"অক্ষরং বর্ণনির্মাণং বর্ণমপ্যক্ষরং বিদুঃ।"

অর্থাৎ অক্ষর শব্দের এক অর্থ 'বর্ণনির্মাণ' এবং অপর অর্থ 'বর্ণ'। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে— (১) সিলেব্‌ল্ শব্দের অদ্ব্যর্থক কোনো নাম নেই, তাই 'বর্ণনির্মাণ' বলে তার পরিচয় দিতে হয়েছে ; (২) ইংরেজিতে যাকে বলে লেটার, এস্থলে 'বর্ণ' শব্দের দ্বারা তাকেই বোঝাচ্ছে ; (৩) 'অক্ষর' ও 'বর্ণ' অভিন্নার্থক শব্দ।

বর্ণ শব্দটিও অক্ষরের মতোই দ্ব্যর্থক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' আছে, "বর্ণ— অক্ষর, শব্দাংশ (syllable)"। এখানে অক্ষর মানে letter। আর, সিলেব্‌ল্‌এর যে যথার্থ প্রতিশব্দ নেই, তার প্রমাণ 'শব্দাংশ' এবং তার সঙ্গে ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়ার প্রয়োজনবোধ। পূর্বোক্ত 'বর্ণনির্মাণ' এবং এই 'শব্দাংশ', দুটি কথাই সিলেব্‌ল্ বোঝাবার প্রয়োজনে রচিত। শুধু

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নয়, সমস্ত অভিধানেই অক্ষর শব্দের ন্যায় বর্ণ শব্দেরও letter ও 'বর্ণনির্মাণ' বা 'শব্দাংশ', এই দুই অর্থ স্বীকৃত।

শুধু আভিধানিক অর্থের উপরে নির্ভর না করে সাহিত্যিক প্রয়োগের প্রতি লক্ষ করা যাক। গীতায় আছে "অক্ষরাণামকারোঽস্মি" (১০৷৩৩)। এখানে অক্ষর মানে অকারাদি-হকারান্ত বর্ণমালার বর্ণ (letter)। মনুতে আছে "ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম" (১১৷২৬৬)। ত্র্যক্ষর মানে অ-উ-ম্ অর্থাৎ ওম্। এখানে তিন অক্ষরে এক সিলেব্‌ল্, সুতরাং অক্ষর মানে letter। কিন্তু গীতায় আছে "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" (৮৷১৩)। এখানে ওম্ শব্দে এক অক্ষর, সুতরাং অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্। ছান্দোগ্য উপনিষদে (২৷১০৷২) আছে, "আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরম্"। এখানেও অক্ষর সিলেব্‌ল্।

এবার ছন্দশাস্ত্রের প্রয়োগের প্রতি লক্ষ করা যাক। 'ছন্দোমঞ্জরী'র একটি শ্লোক এই।—

সানুস্বারশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা ॥
—'ছন্দোমঞ্জরী' ১৷১১

'শ্রুতবোধ'-নামক বহুপ্রচলিত ছন্দোগ্রন্থে আছে—

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন ॥
—'শ্রুতবোধ' ২

দুটি শ্লোকেরই বক্তব্য অবিকল এক। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথম শ্লোকের 'বর্ণ' ও দ্বিতীয় শ্লোকের 'অক্ষর' উভয়েরই এক অর্থ। বস্তুতঃ একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, ছন্দোগ্রন্থে অক্ষর ও বর্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্যই স্বীকৃত হয় না। 'ছন্দোমঞ্জরী'র সপ্তম শ্লোকে আছে অক্ষর, আর একাদশে আছে বর্ণ। 'শ্রুতবোধে'র বিংশ শ্লোকে আছে অক্ষর, একবিংশেই বর্ণ। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রে 'অক্ষরবৃত্ত' এবং 'বর্ণবৃত্ত' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'প্রাকৃতপৈঙ্গলম্', হিন্দি 'ছন্দপ্রভাকর' এবং বাংলা 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রভৃতি অভিধানেও 'বর্ণবৃত্ত' শব্দের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন শাস্ত্রকাররা অক্ষর ও বর্ণ উভয়কেই 'শব্দাংশ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এই 'শব্দাংশ' ঠিক সিলেব্‌ল্ নয়। যেমন— 'ছন্দ' শব্দের অক্ষরবিভাগ হচ্ছে ছ.ন্দ, কিন্তু তার সিলেব্‌ল্‌বিভাগ তথা উচ্চারণবিভাগ হচ্ছে ছন্‌.দ। সুতরাং অক্ষর শব্দটি সিলেব্‌ল্ অর্থে স্বীকার্য হতে পারে না। রাজশেখর বসুও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন (পরিচয় ১৩৫২ কার্তিক)।

বাংলা প্রয়োগের অক্ষর শব্দের অর্থগত অনিশ্চয়তা আরও গুরুতর। অক্ষরপরিচয় (বর্ণপরিচয়), নিরক্ষর (বর্ণজ্ঞানহীন, illiterate), আক্ষরিক (বর্ণগত, literal) প্রভৃতি স্থলে অক্ষর শব্দের অর্থ লেটার, সিলেব্‌ল্ নয়। যুক্তাক্ষর মানেও যুক্ত লেটার, যুক্ত সিলেব্‌ল্ তো হতেই পারে না। কিন্তু যখন বলি 'বালিকা' শব্দে তিন অক্ষর তখন তিন সিলেব্‌ল্‌ই বোঝায়। বাংলায় অক্ষর অর্থের অনির্দিষ্টতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় হসন্তবর্ণযুক্ত শব্দে। হালকা, রেশমী প্রভৃতি শব্দে যখন তিন অক্ষর ধরা হয় তখন অক্ষর মানে কি? পুণ্যবান্ শব্দে তিন সিলেব্‌ল্, কিন্তু চার অক্ষর গণনা করাই রীতি। এস্থলে অক্ষর বলতে কি বোঝায়? তিনটি সিলেব্‌ল্ ও একটি লেটার, এই চারটিই অক্ষর!

এ অবস্থায় স্বীকার করতেই হবে যে, অক্ষর শব্দকে সিলেব্‌ল্‌এর প্রতিশব্দ বলে মানা যায় না। তথাপি যদি অক্ষরকে সিলেব্‌ল্ অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে পণ্ডিত ও অপণ্ডিত উভয় মহলেই ভ্রান্তি ঘটা অনিবার্য হবে।

সিলেব্‌ল্— শব্দের উচ্চারণবিভাগ তথা শ্রুতিবিভাগকে বলা হয় সিলেব্‌ল্, আর লিপিবিভাগের নাম অক্ষর। যেমন, মুক্তি শব্দের লিপি- তথা অক্ষর-বিভাগ হচ্ছে মু.ক্তি, কিন্তু তার উচ্চারণ- ও শ্রুতি-বিভাগ হচ্ছে মুক্‌.তি। সুতরাং 'অক্ষর' মানে 'বর্ণনির্মাণ' বা 'শব্দাংশ' বলে স্বীকার করলেও সিলেব্‌ল্ বলে স্বীকার করা যায় না। লিপির বিচারে 'ক্তি' বর্ণনির্মাণ তথা শব্দাংশ বটে, কিন্তু শ্রুতির বিচারে সিলেব্‌ল্ নয়।

তা হলে সিলেব্‌ল্ শব্দের কি বাংলা করা যায়? দ্বিজেন্দ্রলাল করেছিলেন 'মাত্রা' ('আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকা)। কিন্তু মাত্রা শব্দের এই অর্থ শুধু যে প্রয়োগবিরুদ্ধ তা নয়, মাত্রা শব্দ সিলেব্‌ল্ অর্থে ব্যবহৃত হলে অধিকতর ভ্রান্তির উদ্ভব হবে। সুতরাং সিলেব্‌ল্‌এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'মাত্রা' স্বীকার্য নয়।

বহুকাল পূর্বে রামমোহন রায় সিলেব্‌ল্‌এর প্রতিশব্দ রচনা করেছিলেন

'ধ্বন্যাঘাত'। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' (১৮৩৩) ছন্দ আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, পয়ারের "প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর হয়, তাতে সাত হইতে ন্যূন নহে চতুর্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে। যথা—

ডাক হাঁক ঢাকঢোল মালসাট সার।
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার॥"

অতঃপর তিনি বলেন উপরের উভয় চরণেই চোদ্দ 'অক্ষর' বটে, কিন্তু প্রথম চরণে 'ধ্বন্যাঘাত' সাত ও দ্বিতীয় চরণে বারো। সুতরাং তাঁর মতেও অক্ষর এবং সিলেব্‌ল্ এক বস্তু নয়। তাই তিনি সিলেব্‌ল্‌বোধক একটি নূতন শব্দ রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। সে শব্দটি 'ধ্বন্যাঘাত'। শব্দটি মন্দ নয়, তবে আয়তনে কিছু বড় বলে এবং আরও কোনো কোনো কারণে এটি চলেনি, ভবিষ্যতেও চলবার সম্ভাবনা নেই।

সিলেব্‌ল্ অর্থে আমি এক সময়ে ব্যবহার করতাম 'ধ্বনিব্যষ্টি' বা শুধু 'ধ্বনি'। শব্দটি ছোটো এবং শ্রুতিজ্ঞাপক। ব্যবহারে ভুল বোঝবার আশঙ্কাও কম। যেমন, পুণ্যবান্ শব্দে তিন অক্ষর বললে খটকা লাগে, কিন্তু তিনটি ধ্বনি আছে বললে সন্দেহ থাকে না। 'ধ্বনি' শব্দটিও দ্ব্যর্থকতাহীন নয়, কিন্তু এটার পক্ষে বলবার মতো যুক্তিও আছে। 'শব্দ' মানে আওয়াজ (বন্দুকের শব্দ), কিন্তু ব্যাকরণে word ; 'স্বর' মানেও আওয়াজ (যেমন কণ্ঠস্বর), কিন্তু ব্যাকরণে vowel, সংগীতে note। ঠিক তেমনি 'ধ্বনি' কথাটিকে সিলেব্‌ল্ অর্থে স্বীকার করে নিতে দোষ নেই। কিন্তু ছন্দের আলোচনায় ধ্বনি শব্দের সাধারণ অর্থের ব্যবহারও (যেমন, ধ্বনিগাম্ভীর্য) প্রয়োজন হয়। তাতেই অসুবিধা ঘটে। একই আলোচনায় একই শব্দের সাধারণ ও বিশেষ উভয়বিধ অর্থেই যুগপৎ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন—'ঘন ঘন রুদ্ধধ্বনির (closed syllableএর) ব্যবহারে ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য বাড়ে'। এরকম ব্যবহার নির্দোষ নয়। 'ধ্বনি' শব্দকে সিলেব্‌ল্ অর্থে ব্যবহারের অন্যবিধ অসুবিধাও বোধ করেছি। যেমন, সিলেব্‌ল্ অর্থে 'ধ্বনি' চললেও সিলেবিক্ অর্থে 'ধ্বনিবৃত্ত' একেবারেই অচল। এসব কারণে সিলেব্‌ল্ শব্দের অন্য প্রতিশব্দ খুঁজতে হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ 'শব্দপাপড়ি' ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ভারী শব্দটাকে চালানো সহজ নয়। তার পরিবর্তে 'শব্দদল' বা শুধু 'দল' শব্দটা

চালানো ভালো মনে করি। দ্বিদল, ত্রিদল শব্দ বললে অনায়াসেই dissyllabic, trisyllabic শব্দ বোঝা যায় (তুলনীয় : 'শতদল' পুষ্প)। আমি পূর্বেও মধ্যে মধ্যে 'দল' শব্দটিকে এভাবে সিলেব্‌ল্ অর্থে ব্যবহার করেছি (দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধ, জয়ন্তী-উৎসর্গ ১৩৩৮, পৃ ৮৯)। 'দল' যদি সিলেব্‌ল্ বলে স্বীকৃত হয়, তবে সিলেবিক অর্থে 'দলবৃত্ত' ব্যবহারও অনায়াসে চলতে পারবে। বর্তমানে আমি 'দল' ও 'দলবৃত্ত' শব্দই ব্যবহার করছি। দল শব্দটির মস্ত গুণ এই যে, এর দ্ব্যর্থতা নেই, অর্থাৎ ছন্দের প্রসঙ্গে এটির কোনো দ্বিতীয় অর্থে গৃহীত হবার আশঙ্কা নেই।

দল (Syllable)—একপ্রযত্নোচ্চারিত (অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসে উচ্চারিত) শব্দাংশের নাম 'দল'। এই শব্দাংশ স্বভাবতঃই শ্রুতিসম্মত। লিপি- তথা দৃষ্টি-সম্মত শব্দাংশের নাম 'অক্ষর' বা 'বর্ণ'। ছন্দ ও মুক্তি শব্দের দলবিভাগ যথাক্রমে ছন্.দ ও মুক্.তি। কিন্তু এই দুই শব্দের অক্ষরবিভাগ যথাক্রমে ছ.ন্দ ও মু.ক্তি ; এই বিভাগ উচ্চারণ- ও শ্রুতি-বিরোধী, সুতরাং ছন্দের আলোচনায় অগ্রাহ্য। এই বিভাগ অনুসারে ন্দ ও ক্তি অংশকে বলতে হয় যুক্তাক্ষর। যুক্ত সিলেব্‌ল্ বলে কোনো বস্তু হতে পারে না।

ছন্.দ ও মুক্.তি, এই বিভাগের প্রথমাংশকে বলা যায় 'রুদ্ধদল' (closed syllable) এবং দ্বিতীয়াংশকে 'মুক্তদল' (open syllable)। আমি পূর্বে এরকম শব্দাংশকে যথাক্রমে 'যুগ্মধ্বনি' ও 'অযুগ্মধ্বনি' বলতাম। লক্ষ করেছি তাতে কিছু ভ্রান্তির অবকাশ আছে। 'ধ্বনি' শব্দ বর্জনের কারণ পূর্বেই বলেছি। যুগ্ম-অযুগ্মও ত্রুটিহীন নয়। যুগ্ম বলতে বোঝায় দুই, কিন্তু ছন্ বা মুক্ দুই সিলেব্‌ল্ নয়। তা ছাড়া যুগ্মধ্বনি বললে যুক্তাক্ষর বোঝবার আশঙ্কাও থাকে। এই প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম। তিনি 'বদ্ধধ্বনি' ও 'মুক্তধ্বনি' ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। সিলেব্‌ল্ অর্থে 'ধ্বনি' তিনিও অগত্যাই (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ভালো শব্দের অভাবে) মেনে নেন। এক প্রবন্ধেও (পরিচয় ১৩৫২ কার্তিক) তিনি মুক্তধ্বনি ও বদ্ধধ্বনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রস্তাব আমার কাছে সংগত মনে হয়। তবে 'বদ্ধ' শব্দের চেয়ে 'রুদ্ধ' ভালো মনে করি। কারণ বদ্ধ কথার মধ্যে যে বন্ধনের ভাব আছে তাতে ভুল ধারণা হতে পারে। বস্তুতঃ open ও closed অর্থে মুক্ত ও রুদ্ধ কথা-দুটি আমি বহু পূর্বেই (বিচিত্রা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ) ব্যবহার করেছিলাম। 'রুদ্ধদল' ও 'মুক্তদল' ব্যবহারে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির

সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করি। শব্দদুটি সম্পূর্ণ নূতন এবং নূতন বলেই পূর্ব-সংস্কারজাত ভ্রান্তির অবকাশ নেই। কালক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গেলে নূতনত্বের বাধাও থাকবে না।

রুদ্ধদলের দুই অংশ, স্বতন্ত্র এবং আশ্রিত। ছন্ দলটির ন্ আশ্রিত। আশ্রিত অংশ ব্যঞ্জন না হয়ে স্বরবর্ণও হতে পারে। যেমন— দুই্, বউ্। আশ্রিত স্বরবর্ণকেও (্) এই চিহ্নে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। নতুবা তার স্বরূপ বোঝা যায় না। যেমন— দাও্ শব্দে 'ও' আশ্রিত, কিন্তু দিও শব্দের 'ও' স্বতন্ত্র। তেমনি যাও্, কিন্তু যেও। স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে (্) এই চিহ্নকে হস্‌চিহ্ন বলা চলে না। তাকে বলা যায় 'আশ্রয়চিহ্ন'। এই নামটি ব্যঞ্জন ও স্বর উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রুদ্ধদলের স্বতন্ত্র অংশও স্বরবর্ণ হতে পারে। যেমন— আন্, ওঠ্। উভয় অংশও স্বরবর্ণ হতে পারে। যেমন— উই্, এই্, এও্। এরকম মিলিত স্বরবর্ণকে বলা যায় 'রুদ্ধস্বর' (closed vowel) এবং অ, আ, ই প্রভৃতি অনাশ্রিতান্ত স্বরকে বলা যায় 'মুক্তস্বর' (open vowel)।

প্রস্বর (Accent)—ইংরেজি অ্যাক্‌সেণ্ট্ কথার কি বাংলা করা যায় সেও এক সমস্যা। ঝোঁক কথাটি অনেকেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা এর নেই। তা ছাড়া কথাটার অর্থও স্পষ্ট নয়। তাই স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, বলাঘাত প্রভৃতি শব্দের প্রস্তাব ও ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তাতেও অ্যাক্‌সেণ্ট্ কথার ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় বলে মনে করি না।

অভিধানে 'accent' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে, "Prominence given to a syllable, whether by higher musical pitch, or by stress" (*Concise Oxford Dictionary*)। অন্যত্র আছে, "A superior force of the voice, or of articulative effort, upon some particular syllable" (Webster's *Dictionary*)। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ছান্দসিক সেণ্টস্‌বারিও স্বীকৃতিসহকারে তাঁর *Manual of English Prosody* গ্রন্থে (পৃ ২৬৫) উদ্ধৃত করেছেন। এই দুই ব্যাখ্যা পরস্পরের সমর্থক ও পরিপূরক। এর থেকে বোঝা যায়, কোনো একটি বিশেষ দলকে প্রাধান্য (prominence) দেবার অভিপ্রায়ে কণ্ঠস্বরের (voice) যে উৎকর্ষ বা প্রকর্ষ (superiority) ঘটে তারই নাম অ্যাক্‌সেণ্ট এবং সে প্রকর্ষ pitch-জনিতও হতে পারে, stress-জনিতও হতে পারে। সুতরাং কণ্ঠস্বরের এই উৎকর্ষ বা প্রকর্ষকে অর্থাৎ

অ্যাক্সেণ্টকে বলা যায় স্বরোৎকর্ষ বা স্বরপ্রকর্ষ। মোহিতলাল অ্যাক্সেণ্টের বাংলা করেছেন 'স্বরোৎঘাত' (তুলনীয় স্বরাঘাত)। শব্দটি মন্দ নয়, অ্যাক্সেণ্টের ভাব তাতে বেশ বোঝা যায়। স্বরোৎকর্ষও তাই। কিন্তু দুটি শব্দই ভারী বলে চালানো কঠিন। তাই আমি প্রকৃষ্ট স্বর অর্থে 'প্রস্বর' কথাটার পক্ষপাতী। তাতে স্বরপ্রকর্ষের ভাবটাও স্পষ্ট হয়। অনেক দিন যাবৎই আমি এই শব্দটি ব্যবহার করছি।

বস্তুতঃ আমাদের প্রাচীন ভাষায় 'স্বর' কথাটাই অ্যাক্সেণ্ট্ অর্থে ব্যবহৃত হত। বেদের উদাত্তাদি অ্যাক্সেণ্টকে বলা হয়েছে স্বর এবং এই অ্যাক্সেণ্ট্ নিরূপণের জন্য যে নিয়ম করা হয়েছে তাও 'স্বরসূত্র' নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক কালে অ্যাক্সেণ্ট্ অর্থে স্বর ব্যবহার করা চলে না। স্বর শব্দটির অর্থ বহুবিধ— যেমন, স্বরবর্ণ, গানের সুর। তাই 'স্বর' শব্দটির সঙ্গে একটি 'প্র' যোগ করে ব্যবহার করলে প্রাচীন ঐতিহ্যও রক্ষিত হয়, দ্ব্যর্থহীন ভাবে বিশেষ অর্থে ব্যবহারেও বাধা থাকে না।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে (১৮৮৫) অ্যাক্সেণ্টের বাংলা করেছিলেন 'প্রস্বন'। দিলীপকুমার রায় তাঁর 'ছান্দসিকী'তে এই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। এই শব্দটি মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে 'প্রস্বর' শব্দটি অধিকতর অর্থজ্ঞাপক বলে মনে করি। প্রথমতঃ, স্বন ধ্বনিবোধক বটে, কিন্তু কণ্ঠধ্বনিবোধক নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্বন শব্দের কোনো ঐতিহ্যবাহকত্ব নেই।

যা হক, 'স্বরাঘাত' প্রভৃতি শব্দের তুলনায় 'প্রস্বর' শব্দের আর-এক সুবিধা এই যে, এটিকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করা যায়। যেমন— প্রস্বরণ (accentuation), প্রস্বরিত (accented), প্রাস্বরিক (accentual)। অন্য শব্দগুলিকে এভাবে রূপান্তরিত করা চলে না।

পূর্বে দেখেছি অ্যাক্সেণ্ট্ দ্বিবিধ। এই দুরকম অ্যাক্সেণ্টকে বলা যায় যথাক্রমে 'গীতিপ্রস্বর' (musical বা pitch accent) এবং 'বলপ্রস্বর' (stress accent)। Stress অর্থে 'বল' শব্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের এক স্থলে (তৃতীয় সং, পৃ ১৪৭) বলা হয়েছে, "লয় প্রকাশ করণার্থ গানের কোন কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ করিতে হয় ; সেই বলবৎ উচ্চারণের নাম প্রস্বন (*accent*)"। এই সবল বা বলবৎ উচ্চারণের কথা থেকেই আমার মনে হয় যে, stress অর্থে 'বল' শব্দ ব্যবহার

করা চলে। ইদানীং কালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওই অর্থেই 'বল' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর এই প্রয়োগ খুবই সংগত ও গ্রহণযোগ্য মনে করি। কিন্তু আমার মতে বলময় প্রস্বর অর্থে 'বলপ্রস্বর' শব্দের প্রয়োগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবল অ্যাক্‌সেণ্ট্ অর্থেই 'বল' শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয় মনে করি না। তাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। ইংরেজি অ্যাক্‌সেণ্ট্ মুখ্যতঃ বলময়। তাই ইংরেজি ভাষার প্রসঙ্গে অ্যাক্‌সেণ্ট্ বলতে সাধারণতঃ বল বোঝায়। বাংলা অ্যাক্‌সেণ্টও প্রধানতঃ বলময়। সুতরাং বাংলাতেও প্রস্বর বললে সাধারণতঃ বলই বোঝায়। তাই আমি মনে করি অ্যাক্‌সেণ্ট্ অর্থে প্রস্বর, স্ট্রেস অর্থে বল এবং স্ট্রেস-এক্‌সেণ্ট বোঝাতে 'বলপ্রস্বর' বলা সংগত। Accented-unaccented বোঝাতে প্রস্বরিত-অপ্রস্বরিত বলাই যথেষ্ট, সাধারণতঃ বলময়-বলহীন (stressed-unstressed) বলবার প্রয়োজন নেই।

কেউ কেউ গীতিপ্রস্বর, বলপ্রস্বর ছাড়া আর-এক রকম প্রস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাকে বলা হয় duration accent। এই তৃতীয় প্রকার প্রস্বরের বাংলা করা যায় 'ব্যাপ্তিপ্রস্বর'। যেমন, 'সুশীতল' শব্দের 'শী' দলটিতে ব্যাপ্তিপ্রস্বর আছে একথা বলা চলে। ব্যাপ্তিপ্রস্বরের অস্তিত্ব মানা উচিত কিনা তা আমাদের বিচার্য নয়। আমাদের বিচার্য শুধু পারিভাষিক প্রতিশব্দ রচনার বিষয়। ব্যাপ্তিপ্রস্বরকে অস্বীকার করতে হলেও পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে।

Primary ও secondary accent অর্থে প্রয়োজনমতো মুখ্য ও গৌণ প্রস্বর, অধিপ্রস্বর-উপপ্রস্বর বা প্রস্বর-উপপ্রস্বর বলা চলতে পারে।

মাত্রা (Unit of measure)— যার দ্বারা কোনো কিছুর পরিমাপ করা যায় তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। 'মীয়তে অনয়া ইতি মাত্রা'। এক কথায় বলা যায়, মাত্রা মানে পরিমাপক (unit of measure)। শব্দটি আপেক্ষিক। কেননা, বস্তু- ও আয়তন-ভেদে মাত্রাভেদ ঘটে। এক বস্তুর যা পরিমাপক, অন্য বস্তুর তা নয়। বস্তুভেদে তার মাত্রার নামও বিভিন্ন হয়। কোনো বস্তুর মাত্রা এক ফোঁটা বা আউন্স, অন্য বস্তুর মাত্রা এক ইঞ্চি বা ফুট। তেমনি ছন্দের রীতিভেদেও মাত্রা বিভিন্ন হয়। সংস্কৃত 'জাতি'-বর্গের ছন্দগুলির মাত্রা একটি হ্রস্বস্বরের উচ্চারণকাল। ওই নির্দিষ্ট কালপরিমাণের নাম 'কলা'। সুতরাং জাতিবর্গের ছন্দগুলিকে বলা যায় 'কলামাত্রিক'। কিন্তু বৈদিক ছন্দসমূহের মাত্রা

কলানিরপেক্ষ 'অক্ষর'। সুতরাং এসব ছন্দকে বলা যায় 'অক্ষরমাত্রিক'। অক্ষর বলতে যদিও ঠিক সিলেব্‌ল্ বোঝায় না, তবু সিলেব্‌ল্ অর্থ ধরে হিসাব করলেও গণনায় ভুল হয় না। তাই বৈদিক ছন্দকে syllabic বলেই বর্ণনা করা হয়।

কলা (Mora)—একটি হ্রস্বস্বরের উচ্চারণকালের নাম 'কলা'। প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রে কলা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ছন্দোমঞ্জরী'র (১।১০) 'জ্ঞেয়াঃ···চতুষ্কলাঃ গণাশ্চতুর্লঘূপেতাঃ' এবং 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র (১।২) 'অণ্ণো লহু হোই সুদ্ধ এক্কঅলো' (এক্কঅলো = এককলঃ) প্রভৃতি উক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে কলা ও মাত্রা সমার্থক রূপেই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু একটু ভাবলেই এদের তাৎপর্যগত পার্থক্য বোঝা যায়। কলা শব্দের আসল অর্থ সূক্ষ্ম অংশ, আর মাত্রা শব্দের অর্থ পরিমাপক। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের জাতিবর্গীয় ছন্দে একটি লঘুস্বরের উচ্চারণকালই তার সূক্ষ্ম অংশ বা কলা এবং এই কলাই মাত্রারূপে স্বীকৃত। সুতরাং এসব ছন্দ হচ্ছে আসলে কলামাত্রিক। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে কলা ছাড়া আর কোনো মাত্রা বা পরিমাপক নেই। তাই কলা ও মাত্রাকে অভিন্নার্থে গ্রহণ করলে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু বাংলায় সব রীতির ছন্দে কলাই মাত্রা নয়; সুতরাং কলা ও মাত্রার পার্থক্য স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। যে রীতির ছন্দে কলাই মাত্রা তাকে বলা যায় 'কলামাত্রিক' (moric), আর যে রীতিতে সিলেব্‌ল্ বা দলই মাত্রা তাকে বলা যায় 'দলমাত্রিক' (syllabic)। 'কলাবৃত্ত' এবং 'দলবৃত্ত' শব্দ কলামাত্রিক ও দলমাত্রিকেরই নামান্তর বলে স্বীকার্য।

মাত্রাবৃত্ত— পূর্বে বলেছি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের জাতিবর্গীয় ছন্দসমূহ আসলে কলামাত্রিক, সুতরাং এগুলিকে কলাবৃত্তও বলা যায়। কিন্তু ও-দুই ভাষায় কলা ছাড়া অন্য কোনো মাত্রা না থাকায় কলা মাত্রারই নামান্তর বলে স্বীকৃত হয়। তাই জাতিচ্ছন্দগুলি 'মাত্রাবৃত্ত' নামেও পরিচিত। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, এই নামটি বস্তুতঃ অর্থহীন। কেননা, পৃথিবীর সব ভাষার সব ছন্দই মাত্রাবৃত্ত, অর্থাৎ কোনো-না-কোনো মাত্রার দ্বারা পরিমিত। মাত্রাবৃত্ত নামটির বাস্তবিকই কোনো সার্থকতা নেই। সুতরাং বাংলা ছন্দের আলোচনায় এই নামটি বর্জন করাই সমীচীন মনে করি। প্রখ্যাত মরাঠি ছান্দসিক মাধবরাও পটবর্ধনও তাঁর 'ছন্দোরচনা' গ্রন্থে মাত্রাবৃত্ত নামটা বর্জন করাই সংগত মনে করেছেন। বলা উচিত যে, বাংলা ছন্দের আলোচনায় মাত্রাবৃত্ত নামটি বোধ হয় আমিই

প্রথম 'চালু' করি ১৩২৯ সালে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র থেকেই আমি নামটি গ্রহণ করেছিলাম। অবশ্য তারও পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন 'তীর্থরেণু' কাব্যে (১৩১৭) 'সংগীতমিস্ত্রির নিবেদন'-শীর্ষক কবিতার পরিচয়সূত্রে। মনে হয় তিনিও এই নামটি গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করতেন। যা হক, আমার ব্যবহারের পরেই 'মাত্রাবৃত্ত' নামটি সুপ্রচলিত হয়েছে। কিন্তু অধিকতর বিচারের ফলে আমি বর্তমানে ওই নামটি ত্যাগ করারই পক্ষপাতী হয়েছি। মাত্রাবৃত্তের পরিবর্তে 'কলামাত্রিক' বা 'কলাবৃত্ত' নামটি ব্যবহার করাই সংগত মনে করি।

অক্ষরবৃত্ত—মাত্রাবৃত্তের ন্যায় অক্ষরবৃত্ত নামটাও আমিই প্রথম চালাই (১৩২৯)। সে সময় থেকেই নামটি সুপরিচিত হয়েছে। এটিও সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র থেকেই গ্রহণ করেছিলাম। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত আর বাংলা অক্ষরবৃত্ত এক প্রকৃতির নয়। তা ছাড়া পূর্বেই দেখেছি বাংলায় 'অক্ষর' শব্দের অর্থও অনিশ্চিত। তাই বাংলায় এই নামটির প্রচলন ভালো হয়নি, তার ফলে অনেক ভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 'অক্ষরবৃত্ত' কথাটির অর্থ অনিশ্চিত বলে বিভিন্ন লোকের মনে এর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। বস্তুতঃ মাত্রাবৃত্ত নামের চেয়েও 'অক্ষরবৃত্ত' নাম আপত্তিজনক। কিন্তু বাংলায় অনিশ্চিতার্থক অক্ষর গণনা করেই এজাতীয় ছন্দের হিসাব রাখা হয়, এ কথা মনে রেখেই আমি ওই নামটি ব্যবহার করেছিলাম। আমরা দেখেছি রামমোহন রায় জানতেন অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্ নয়, তবু তিনি বলেছেন, পয়ারের "প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ 'অক্ষর' হয়"। লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়ে'ও (১৮৬৫) বলা হয়েছে, "পয়ারের প্রথম চরণ আট-আট 'অক্ষরে' সম্বদ্ধ, শেষ চরণ ছয়-ছয় 'অক্ষরে' সম্বদ্ধ হয়"। অক্ষরগণনার এই প্রচলিত রীতির প্রতি লক্ষ রেখেই আমি 'অক্ষরবৃত্ত' নাম ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু অক্ষরগণনার রীতিটাই ভ্রান্ত। ওরকম গণনার ফলে ছন্দরচনাতেও ত্রুটি ঘটেছে। এখানে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সত্যেন্দ্রনাথও অক্ষরগণনার রীতি তথা অক্ষরবৃত্ত নামটার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি এটিকে 'অক্ষরগোনা' ছন্দ বলে পুনঃপুনঃ নিন্দা করেছেন। তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।—

"ওজন বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভরতি করবার দিকে যাঁদের বেশি ঝোঁক

তাঁরাই একদিন একে পয়ারের কাঠগড়ায় পূরে এর চেহারা বিগড়ে দিতে গিয়েছিলেন। মধ্যযুগের ফারসিনবিশ লিখিয়েরা···বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষর-বৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন।”

—ছন্দ-সরস্বতী, ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ১২

অক্ষরগণনার রীতি এবং তদনুসারে কৃত ‘অক্ষরবৃত্ত’ নামটার ত্রুটি আমাকে দীর্ঘকাল পীড়া দিয়েছে। এই স্বকৃত ত্রুটি সংশোধন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অক্ষরবৃত্ত যে আসলে অক্ষর-বৃত্ত নয়, একথা সাহিত্যপরিষৎ-মন্দিরে এক বক্তৃতায় (১৩৩৮ ভাদ্র) প্রথম ব্যক্ত করি। সে বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

“বাংলার বহুপ্রচলিত মামুলি ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়াছি— যেহেতু ঐ ছন্দ দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু শুধু অক্ষরগণনার উপর ভিত্তি করিয়া কোনো ছন্দ রচিত হইতে পারে না ; কারণ ছন্দের মূলতত্ত্ব অক্ষর নহে, ধ্বনি।···কিন্তু অক্ষরগণনার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলেও একটি ধ্বনিতত্ত্ব আছে, নতুবা এরকম ছন্দরচনা সম্ভব হইত না।···অক্ষরবৃত্ত আসলে একটি যৌগিক ছন্দ।”

—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ বর্ষের ২য় মাসিক কার্যবিবরণ, পৃ ২২

উক্ত বক্তৃতার বিবরণ আমারই লিখিত। অতঃপর “বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান” নামক প্রবন্ধেও (১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে লিখিত) ঠিক এই কথাই বলি।—

“অক্ষরবৃত্ত আসলে একটি মিশ্রপ্রকৃতির ছন্দ। লিখিত হরফ বা অক্ষরের সংখ্যা গুনে রচনা করার প্রথা থেকেই এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং বর্তমানেও প্রধানতঃ অক্ষরসংখ্যা গুনেই এ ছন্দ রচিত হয়। তাই এ ছন্দের নাম দেওয়া হয়েছে অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু আসলে অক্ষরসংখ্যা এ ছন্দের মূলগত তত্ত্ব নয় ; ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হতে পারে না।”

—জয়ন্তী-উৎসর্গ (১৩৩৮ পৌষ), পৃ ৭৬

১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে “অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ” নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। কয়েক মাস পরে সেটি ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত

হয়। তাতে আমি বহু যুক্তি- ও তথ্য -যোগে দেখাতে চেষ্টা করি যে, তথাকথিত অক্ষরবৃত্তও আসলে অক্ষরসংখ্যাত নয়, বরং অক্ষরসংখ্যার সমতা রক্ষার চেষ্টাতেই এই শ্রেণীর ছন্দে যথেষ্ট ত্রুটি দেখা দিয়েছে। তার ফলে বাংলা সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আমাদের পক্ষে সে ইতিহাস নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, এই বিতর্কের প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথও দৃষ্টান্তযোগে দেখালেন যে—

অক্ষরসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হলেও প্রচলিত পয়ারের ছন্দ অব্যাহত থাকতে পারে।

অতঃপর তিনি মন্তব্য করলেন—

"আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র।"

—পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৩৭৮ ; 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৬২), পৃ ৬১

রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়ে আমি অক্ষরবৃত্ত নাম পরিত্যাগ করে আমার পূর্বব্যবহৃত 'যৌগিক' (composite) নামটাই চালাতে থাকি। এই নাম প্রথম ব্যবহার করি ১৩৩৮ সালের ভাদ্রমাসে (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা)। ওই সালের মাঘসংখ্যা বিচিত্রাতেও লিখেছিলাম, "আসলে এটি একটি যৌগিক বা মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ" (পৃ ১২০)। অতঃপর আমি এই নামটাই ব্যবহার করতে থাকি বটে, কিন্তু আমার মনে দ্বিধা থেকে যায়। কারণ 'যৌগিক' শব্দটা অক্ষরবৃত্তের মতো প্রত্যক্ষভাবে ভ্রান্ত ধারণার সহায়ক না হলেও স্পষ্টার্থজ্ঞাপকও নয়, তাই এটি পরোক্ষভাবে ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া শুধু যৌগিক বললে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না, ব্যাখ্যার অপেক্ষা থাকে। তাই আমি অন্য নামের প্রয়োজন বোধ করি। অতঃপর এটির নূতন নাম দিই 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক' (শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৫২)। কেননা, এই রীতিটা বস্তুতঃই কলামাত্রিক, কিন্তু এর কলাগণনা সরল নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই।—

ফা-ল্গুনে | বিকশিত | কা-ঞ্চ-ন | ফু-ল,
ডালে ডালে | পু-ঞ্জিত | আ-ম্র : মুকু-ল।
চ-ঞ্চ-ল | মৌমাছি | গু-ঞ্জরি | গা-য়,
বেণুবনে | ম-র্মরে | দ-ক্ষি-ণ | বা-য়।

—'চিত্রবিচিত্র', ফাল্গুন

এটা হচ্ছে সরল কলামাত্রিক পয়ার। এর কলাগণনার প্রণালী সরল, প্রতি মুক্তদলে এক কলা এবং রুদ্ধদলে দুই কলা। কিন্তু

ফাল্গুনেতে | বিকশিত | কাঞ্চনে-র | ফু-ল,
ডালে ডালে | পুঞ্জীভূত | আম্রে-র মু : কু-ল।
সুচঞ্চ-ল | মৌমাছিরা | গুঞ্জরিয়া | গা-য়,
বেণুবনে | মর্মরিছে | দক্ষিণে-র | বা-য়

এটা বিশিষ্ট কলামাত্রিক পয়ার। এর কলাগণনার প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ তার মুক্তদলে এক কলা, কিন্তু সব রুদ্ধদল দ্বিকল নয়। শব্দের প্রান্তস্থিত রুদ্ধদলে দুই কলা এবং অন্যত্র এক কলা, এভাবে হিসাব করলে প্রতি পূর্ণপর্বে চার কলা পাওয়া যাবে। (দণ্ডচিহ্নে এক কলা, হাইফেনচিহ্নে দুই কলা।) এটা বোঝাও সহজ। তাই 'অক্ষরবৃত্ত' (বা অক্ষরমাত্রিক) বা 'যৌগিক' নামের বদলে এই নামটাই গ্রহণীয় মনে করি। তবে 'বিশিষ্ট' না বলে 'মিশ্র' বললে আরও ভালো হয়। কেননা তাতে এই রীতির বিশিষ্টতা কোথায় তা নির্দিষ্ট হয় এবং এই রীতির স্বরূপ উপলব্ধিও সহজতর হয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

যত চাপিলাম মুঠি
পাপড়িগুলি গেল টুটি,
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়!

—'কড়ি ও কোমল', বিদেশী ফুলের গুচ্ছ (ব্রাউনিং-জায়া)

শুধু অক্ষর গুনতে গেলে এর দ্বিতীয় পদে এক অক্ষর বেশি হয়। অথচ ছন্দ ভুল বলা যায় না। তাই অক্ষরবৃত্ত না বলাই সংগত। বস্তুতঃ 'পাপড়ি' শব্দেও 'কান্না'র মতোই দুই কলা ধরতে হবে। মিশ্র কলামাত্রিক বললে গণনারও সুবিধা হয়, নাম থেকেই ছন্দের প্রকৃতি বোঝাও সহজ হয়।

স্বরবৃত্ত— যে ছন্দকে অনেক সময় 'ছড়ার ছন্দ' বলা হয় তার স্বরূপসূচক নাম রচনাও একটা সমস্যা। 'ছড়ার ছন্দ' কথাটা ও-ছন্দের প্রকৃতিপরিচায়ক নয়। তা ছাড়া এ ছন্দ শুধু যে ছড়াতেই আছে তাও নয়, বস্তুতঃ এটি সব রকম লোকসাহিত্যের ছন্দ। তাই এটিকে 'লৌকিক ছন্দ' (folk metre) বললেই

ঠিক হয়। 'ছড়ার ছন্দ' বললে অব্যাপ্তিদোষ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দকে প্রাকৃত বাংলা ছন্দ, বাংলা প্রাকৃত ছন্দ এবং কখনও কখনও শুধু প্রাকৃত ছন্দও বলেছেন। এ নামে অব্যাপ্তিদোষ নেই। কিন্তু 'প্রাকৃত' শব্দটাতে দ্ব্যর্থতা রয়েছে। তাই লোকসাহিত্যের বাহন বলে একে 'লৌকিক' রীতির ছন্দ বলাই ভালো। তাতে 'ছড়ার ছন্দ' নামের অব্যাপ্তি এবং 'প্রাকৃত' রীতির ছন্দ নামের দ্ব্যর্থতা তাতে নেই।

কিন্তু 'লৌকিক' নামটাও ওই ছন্দোরীতির উৎপত্তিরই পরিচায়ক, প্রকৃতির নয়। সরল কলামাত্রিক ও মিশ্র কলামাত্রিকের ন্যায় একটি প্রকৃতিজ্ঞাপক নাম থাকাও অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ ছন্দের প্রকৃতি কি তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোন্ মত ঠিক তা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। বিভিন্ন মতে তার কি নাম হতে পারে তাই আমাদের বিচার্য। দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র (মজুমদার), সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, কালিদাস রায় -প্রমুখ অনেকেই মনে করেন এ ছন্দ মূলতঃ সিলেবল্-সংখ্যাত অর্থাৎ syllabic। পক্ষান্তরে সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, অমূল্যধন-প্রমুখ কয়েক জনের মতে এ রীতির ছন্দ মূলতঃ স্বরাঘাত- বা শ্বাসাঘাত-প্রধান অর্থাৎ accentual। এই syllabic ও accentual কথা-দুটির বাংলা কি হতে পারে তাই প্রশ্ন।

আমি এই রীতির ছন্দকে সিলেবিক বলে বর্ণনা করাই সমীচীন মনে করি। কিন্তু তার বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করা সহজ নয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি প্রভৃতি কোনো ভাষাতেই ঠিক সিলেব্‌ল্‌বোধক কোনো শব্দ নেই। তাই আমি একটি পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করেছিলাম। প্রত্যেক সিলেব্‌ল্‌এরই মূল-উপাদান হচ্ছে স্বর (vowel) এবং এক সিলেব্‌ল্‌এ একটির বেশি স্বর (মুক্ত বা রুদ্ধ) থাকতে পারে না। তাই কোনো শব্দে যত স্বর তত সিলেব্‌ল্। সুতরাং দ্বিস্বর শব্দের মানে dissyllabic, ত্রিস্বর মানে trisyllabic। চতুঃস্বর পর্ব বলতে বোঝাবে tetrasyllabic foot। তাতে খুব অসুবিধা হয় না। তার থেকেই 'স্বরবৃত্ত' নামটা চালিয়েছিলাম ১৩২৯ সালেই। সেই সময় থেকেই এই নামটা সুপ্রচলিত হয়ে গেছে। সাধারণ পাঠক এই নামটাকে রূঢ়ার্থেই গ্রহণ করেন, অর্থ-জ্ঞাপকতার প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। বলা বাহুল্য, সিলেবিক কথার এই পরোক্ষ প্রতিশব্দে আমি তৃপ্ত হতে পারিনি। অগত্যা ওটাই চালিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সুষ্ঠুতর শব্দের প্রয়োজন বোধ করেছি সর্বদাই।

তা ছাড়া স্বরবৃত্ত নামটা কারও কারও মনে ওই ছন্দটা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছে, তাও দেখেছি। তাই আমি ওই নামটা বর্জন করে সিলেব্‌ল্ অর্থে 'দল' (মানে শব্দদল) এবং সিলেবিক অর্থে দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত ব্যবহার করাই সংগত মনে করেছি। দ্বিদল শব্দ মানে dissyllabic শব্দ, ত্রিদল মানে trisyllabic, বহুদল polysyllabic।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সিলেবিক কথার বাংলা করেছেন 'পদাংশমাত্রিক' বা 'পাদমাত্রিক'। 'পাদক' নামটা সহজ এবং ব্যবহারেও সুবিধাজনক। স্বরবৃত্ত কথার চেয়ে পাদকমাত্রিক যে ভালো তাতেও সন্দেহ নেই। তবে সিলেব্‌ল্ অর্থে পাদক না বলে 'দল' বলাই অধিকতর সংগত মনে হয়। পাদক মানে ক্ষুদ্র পাদ বা পদ। তাতে সংশয় সৃষ্টির কিছু সম্ভাবনা থাকে। পদাংশ মানে এখানে শব্দাংশ। কিন্তু ছন্দে পাদ বা পদ মানে শব্দ নয়। এসব বিবেচনায় পদাংশ বা পাদকের পরিবর্তে 'দল' শব্দটাই গ্রহণীয় মনে হয়। সুতরাং সিলেবিক কথার বাংলা হবে দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত। সত্যেন্দ্রনাথও সিলেব্‌ল্‌কে 'শব্দপাপড়ি' এবং সিলেবিক ছন্দকে 'পাপড়িগোনা ছন্দ' বলেই বর্ণনা করেছেন।

Accentual কথার বাংলা হবে প্রাস্বরিক বা প্রস্বরবৃত্ত। প্রস্বর কথার প্রসঙ্গেই তা বলা হয়েছে।

যতি (Pause)— পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে আছে "যতিবিচ্ছেদঃ" (৬।১)। হলায়ুধ তার ব্যাখ্যা করেছেন, "বিচ্ছিদ্যতে বিভজ্যতে পদপাঠোঽস্মিন্নিতি বিচ্ছেদো বিশ্রামস্থানম্, স চ যতিরিত্যুচ্যতে"। ছন্দোমঞ্জরীতেও (১।১৮) ঠিক এই কথাই আছে—

"যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া ॥

উচ্চারণের বিশ্রামস্থানকেই বলে যতি এবং বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি শব্দ যতিরই নামান্তর। বস্তুতঃ যতির দ্বারা পদ্যের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয় বলেই তার অপর নাম বিচ্ছেদ বা ছেদ। এই ছেদ বা যতি দ্বিবিধ— ছন্দের প্রয়োজনগত এবং ভাবের প্রয়োজনগত। ছন্দোগত যতিকে বলা যায় 'ছন্দোযতি' (metrical pause) এবং ভাবগত যতিকে বলতে পারি 'ভাবযতি' (sense pause)। অমূল্যধনপ্রমুখ কেউ কেউ শুধু ছন্দোযতিকেই যতি বলেন আর ভাবযতিকে বলেন ছেদ; এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশ্লেষণেই এই পার্থক্যরক্ষা বিশেষ

প্রয়োজন মনে করেন। আমার কিন্তু মনে হয় যতি ও ছেদের মধ্যে এই প্রভেদ-কল্পনা শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তা নয়, বরং অকারণ জটিলতার দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদনেরও সহায়ক। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি প্রভৃতি সব ভাষাতেই যতি ও ছেদ অভিন্ন বলে স্বীকৃত। এ অবস্থায় এই দুটি অভিন্নার্থক শব্দের মধ্যে পার্থক্য করলে ভুল বোঝবার সম্ভাবনাই বাড়বে। প্রয়োজনমতো 'ভাবযতি' এবং 'ছন্দোযতি' ব্যবহার করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং ভ্রান্তির পথও রুদ্ধ হয়। ইংরেজিতেও যখন sense pause এবং metrical pauseএ কাজ চলে তখন বাংলাতেই চলবে না কেন?

যতির তারতম্যভেদও লক্ষ করা প্রয়োজন। সব যতির গুরুত্ব সমান নয়। ইংরেজি এবং সংস্কৃতেও যতির গুরুত্বভেদ স্বীকৃত হয়। Strong pause, weak pause প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। সংস্কৃতে অত স্পষ্টভাবে না বললেও পরোক্ষ উল্লেখ আছে। বাংলায় তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেই সুবিধা হয়। যেমন—

নদীতীরে | বৃন্দাবনে ‖ সনাতন | একমনে ‖ জপিছেন | নাম।

—'কথা', স্পর্শমণি

এখানে সর্বশেষে আছে পূর্ণযতি (full pause), দ্বিদণ্ডচিহ্নিত (‖) স্থানগুলিতে আছে অর্ধযতি (medial pause বা cæsura) এবং একদণ্ডচিহ্নিত (|) স্থানগুলিতে আছে লঘুযতি (light বা primary pause)। যতিগুলির তারতম্য স্বতঃপ্রকাশ। সুতরাং ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। একটু যত্ন করে লক্ষ করলে প্রত্যেকটি বড় পর্বের মধ্যে একটি লঘুতর যতিও অনুভূত হবে। যেমন—

নদী : তীরে | বৃন্দা : বনে ‖ সনা : তন | এক : মনে ‖

এই দ্বিবিন্দুচিহ্নিত লঘুতর যতিকে বলা যায় 'উপযতি' (secondary pause)।

যতির এই তারতম্য স্বীকারের সার্থকতা আছে। কারণ বিভিন্ন রকমের যতিবিভাগের দ্বারাই ছন্দের বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যতিবিভাগগুলির কি নাম হওয়া উচিত তাও বিচার করা প্রয়োজন। পূর্ণযতির দ্বারা খণ্ডিত ছন্দোবিভাগকে বলব 'পংক্তি'। অর্ধযতির বিভাগকে বলি 'পদ'। লঘুযতিবিভাগের নাম 'পর্ব'। আর উপযতিবিভাগ হচ্ছে 'উপপর্ব'। একে একে এই নামগুলির যৌক্তিকতা বিচার করা যাক।

পংক্তি (Verse, Metrical line)—পূর্ণযতির বিভাগকে অনেকেই বলেন 'চরণ'। আবার কেউ কেউ বলেন 'পদ'। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী' কবিতার নাম থেকেই বোঝা যায় যে, ছন্দের বৃহত্তম বিভাগকেই তিনি পদ বলতেন। বস্তুতঃ চরণ ও পদ সমার্থক শব্দ। আমার মতে verse অর্থে চরণ ও পদ শব্দ ব্যবহার সংগত নয়। ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায় পদ শব্দের যথার্থ প্রয়োগ কি হওয়া উচিত।

অঘ্রানে শীতের রাতে ‖
নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে ‖
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।

—'কথা', মূল্যপ্রাপ্তি

বলা বাহুল্য, এটি একটি ত্রিপদী লাইন। কিন্তু এই 'লাইন'কে যদি চরণ বা পদ বলা যায় তবে একথাও বলতে হয় যে, ত্রিপদীর এক চরণে বা এক পদে তিন পদ থাকে। তাতে যে স্ববিরোধিতা দোষ ঘটে তা সুস্পষ্ট। লালমোহন বিদ্যানিধি এই অসুবিধাটা বহু পূর্বেই অনুভব করেছিলেন। তাঁর 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে পূর্ণযতির বিভাগকে কখনও 'চরণ' কখনও 'পদ' বলা হয়েছে। ত্রিপদীর তিনটি অংশকেও 'চরণ' ও 'পদ' বলা হয়েছে। তাই তাঁকে একাধিবার সাবধান করতে হয়েছে যে, দু-রকমের পদ বা চরণ একার্থক নয়। কিন্তু পূর্ণযতির বিভাগকে 'পংক্তি' বললে এই অসংগতি ঘটে না। অর্থাৎ, ত্রিপদীর পংক্তিতে তিন পদ বললে কোনো বাধা হয় না। 'পংক্তি' শব্দটি অর্বাচীন নয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকা), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ('আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকা), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ('ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধ) প্রভৃতি অনেকেই পংক্তি শব্দ ব্যবহার করেছেন। পংক্তি কথার বিশেষ সার্থকতাও আছে। পংক্তি মানে সারি। প্রতি পংক্তিতে কয়েকটি পর্ব বা পদ থাকে। সুতরাং তাকে পর্ব বা পদের সারি বা পংক্তি বলা অসংগত নয়।

মুদ্রিত বা লিখিত লাইনকে বলি 'ছত্র'। ছন্দোবদ্ধ এক পংক্তিকে ভেঙে একাধিক ছত্রে লেখা যায়। যেমন, ত্রিপদীর এক পংক্তি প্রায়ই দুই বা তিন ছত্রে লিখিত হয়।

পদ (Verse clause)— ছন্দোময় রচনামাত্রেরই পদ নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। কেননা, পদবদ্ধ রচনারই নাম 'পদ্য'। পদ না থাকলে পদ্যই হতে

পারে না। এই জন্যই দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি নামের এত প্রচলন। পূর্বে বলেছি অর্ধযতিবিভাগেরই নাম 'পদ'। কোনো কোনো সময় পদকেই পর্ব বলে মনে হয়। যেমন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে ‖ পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও ‖ তোমার সন্তানে।

—'চৈতালি', বঙ্গমাতা

এর প্রতি পংক্তিতে দুই 'পর্ব' বলা ঠিক নয়। অর্ধযতির প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই 'পদ' বলাই সংগত। পয়ারপংক্তি যে আসলে দ্বিপদী, একথা লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে বহু পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে। "এক-একটি কবিতায় যত পদ অর্থাৎ চরণ (প্রধান বিভাগ) থাকে তাহা ধরিয়া বঙ্গভাষায় ছন্দঃ গণনা করা হয়। যথা ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি। এই নিয়মানুসারে পয়ারকে দ্বিপদী বলা যাইতে পারে" ('কাব্যনির্ণয়', নবম সং, পৃ ৮৯)। আধুনিক কালে মোহিতলালও সুস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে পদবিভাগ সুস্পষ্ট। কিন্তু সরল কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতিতে পদবিভাগ সম্বন্ধে ভ্রান্তি দেখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিই।—

নমো নমো নমঃ | সুন্দরী মম ‖ জননী বঙ্গ | -ভূমি,
গঙ্গার তীর | স্নিগ্ধ সমীর ‖ জীবন জুড়ালে | তুমি।

—'চিত্রা', দুই বিঘা জমি

এটা সাধারণতঃ ত্রিপদী নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে এটি দ্বিপদী। প্রতি পংক্তি একটি অর্ধযতির দ্বারা দুই পদে বিভক্ত। এটা ত্রিপবিকও নয়, এর পংক্তিগুলি চার পর্বে বিভক্ত।

তুরঙ্গসম | অন্ধনিয়তি ‖
বন্ধন করি | তায়,
রশ্মি পাকড়ি | আপনার করে ‖
বিঘ্নবিপদ্ | লঙ্ঘন ক'রে ‖
আপনার পথে | ছুটাই তাহারে ‖
প্রতিকূল ঘট | -নায়।

—'মানসী', গুরু গোবিন্দ

এর দ্বিতীয় পংক্তিটা (রশ্মি···ঘটনায়) যে চৌপদী, তাতে সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে, প্রথম পংক্তিটা (তুরঙ্গ···তায়) দ্বিপদী, ত্রিপদী নয়।

পর্ব (Foot)—সরল কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির ছন্দে পর্ববিভাগ সুস্পষ্ট, কিন্তু মিশ্রকলাবৃত্তে পর্ববিভাগ সর্বদা পরিস্ফুট থাকে না। তাই মনে হতে পারে এ রীতির ছন্দে পর্ববিভাগ নেই। যেমন—

এ দুর্ভাগ্য | দেশ হতে, ‖ হে মঙ্গল | -ময়,
দূর করে | দাও তুমি ‖ সর্ব তুচ্ছ | ভয়।···
মস্তক তু : -লিতে দাও ‖ অনন্ত আ : -কাশে
উদার আ : -লোক মাঝে ‖ উন্মুক্ত বা : -তাসে।

—নৈবেদ্য, ৪৮

প্রথম দুই পংক্তিতে পর্ববিভাগ সুস্পষ্ট। কিন্তু পরের দুই পংক্তিতে পর্ববিভাগ নেই। এ দুটিতে লঘুযতি লোপ পাবার ফলে দুই পর্ব যুক্ত হয়ে একেবারে পদ গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দুই পংক্তির পদগুলি বিযুক্তপর্বিক, আর পরের দুই পংক্তির পদগুলি যুক্তপর্বিক। এভাবে প্রয়োজনমতো যুক্তপর্বিক পদের ব্যবহারেই ছন্দের গৌরব বাড়ে। ঘন ঘন যতিলোপের ফলেই যুক্তপর্বিক পদের বাহুল্য দেখা যায়। তাই মনে হয় এ রীতির ছন্দে পর্ববিভাগ নেই, পদবিভাগই তার ভিত্তি। এইজন্যই মোহিতলাল এই রীতির ছন্দকে বলেছেন 'পদভূমক'। কিন্তু বস্তুতঃই মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ পর্বহীন নয়।

পক্ষান্তরে সরল কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক রীতির ছন্দও পদহীন নয়। সুতরাং এই রীতিকেও শুধু 'পর্বভূমক' বললে তার সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না। আসলে বাংলার তিন রীতির ছন্দেই পর্ব ও পদ বিভাগ স্বীকার্য। পদের দ্বারা ছন্দের বন্ধ বা আকৃতিই গঠিত হয়। কিন্তু ছন্দের রীতি বা প্রকৃতি নির্ণীত হয় পর্বের প্রকৃতি অর্থাৎ তার গঠনপ্রণালীর দ্বারা। সুতরাং বলতে হয় পর্বই বাংলা ছন্দের ভিত্তি। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে 'পর্ব' শব্দের ব্যবহার নেই, আছে তৎস্থলবর্তী 'গণ' শব্দ। যেমন— চতুষ্কল গণ, পঞ্চকল গণ। 'কাব্যনির্ণয়ে' আছে ষড়ক্ষরী গণ, সপ্তাক্ষরী গণ। সংস্কৃতে যেসব ছন্দে গণবিভাগ স্বীকৃত, সেগুলিকে অনেক সময় বলা হয় 'গণচ্ছন্দ' বা 'গণবৃত্ত'। সে হিসাবে বলতে হয় বাংলার সব ছন্দই আসলে গণবৃত্ত।

পয়ার— "আট-ছয় আট-ছয়, পয়ারের ছাঁদ কয়।" অর্থাৎ পয়ারের প্রতি পংক্তির প্রথম বিভাগে থাকে আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় বিভাগে ছয় মাত্রা। এটাই পয়ার বন্ধের সর্বস্বীকৃত গঠনরীতি। 'কাব্যনির্ণয়'এর সময় (১৮৬৫) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকলেই তা স্বীকার করেন। কিন্তু ইদানীং কারও কারও মনে এ বিষয়ে সংশয় জেগেছে (কবিতা ১৩৫২ চৈত্র, পৃ ১৫৫-৫৬ ও ১৬৯-৭০)।* তাঁরা মনে করেন পয়ার কোনো ছন্দোবন্ধের নাম নয়, ছন্দোরীতির নাম। এই ভ্রান্তির মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিথিল নামকরণ। তিনি মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দকেই কখনও বলেছেন 'সাধু' ছন্দ, কখনও 'পয়ারজাতীয়' ছন্দ। অর্থাৎ ছন্দের একটা জাতিরই (অর্থাৎ একটা শ্রেণী বা ছন্দোরীতিরই) নাম 'পয়ার'। কিন্তু এই বর্ণনা তথা নামকরণ বস্তুতঃই ঠিক নয় এবং সর্বস্বীকৃত অভিমতেরও বিরোধী।

পয়ারের বাঁধুনি কি রকম তা প্রথমেই বলেছি। একথাও বলা হয়েছে যে, পয়ার আসলে দ্বিপদী। তার পদবিভাগ হচ্ছে আট ও ছয় মাত্রায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বক্তব্য এই যে, ওই মাত্রাযোজনা তিন রীতিতেই সম্ভব। সুতরাং পয়ার ত্রিবিধ— সরল কলামাত্রিক, মিশ্র কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক। এই পার্থক্যটা অনুধাবন না করলে ছন্দের আসল তত্ত্বটাই চাপা পড়ে যায়। বহুকাল পূর্বে বিচিত্রায় (১৩৩৯ শ্রাবণ) দৃষ্টান্তযোগে বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ও পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধের প্রকৃতিভেদে তিন রূপ স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

১। পূর্ণিমা চন্দ্রের ‖ জ্যোৎস্না-ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা ‖ তন্দ্রা হারায়।

—'চিত্রবিচিত্র', উৎসব

২। শীর্ণ শান্ত সাধু তব ‖ পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া ‖ লক্ষ্মীছাড়া করে।

—'চৈতালি', বঙ্গমাতা

৩। বিরল তোমার ভবনখানি ‖ পুষ্পকানন-মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ ‖ আপন গৃহকাজে।

—'ক্ষণিকা', কল্যাণী

* দ্রষ্টব্য : বুদ্ধদেব বসু -প্রণীত 'সাহিত্যচর্চা' (১৩৬১), পৃ ১০২-০৩ ও ১১৫-২৪।

তিনটি দৃষ্টান্তই পয়ার বন্ধে রচিত। কেননা, প্রত্যেকটিরই প্রথম পদে আছে আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা। কিন্তু মাত্রাযোজনার পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য অনুসারে এ তিনটিকে বলা যায় যথাক্রমে— সরল কলামাত্রিক পয়ার, মিশ্রকলামাত্রিক পয়ার ও দলমাত্রিক পয়ার।

শুধু পয়ার নয়, ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি বন্ধেরও রচনারীতিভেদে ওই তিন রূপ। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

অমিত্রাক্ষর— অমিত্রাক্ষর নামটা আক্ষরিক অর্থে সংগত নয়। তবে রূঢ়ার্থে ব্যবহার্য বলেই মনে করি। ইংরেজি blank verseও রূঢ়ার্থেই স্বীকৃত হয়েছে। এর অর্থবোধক নাম হিসাবে আমি 'অমিল প্রবহমান পয়ার' কথাটা ব্যবহার করি। *Enjambement* অর্থে প্রবহমানতা। যে পয়ার বন্ধে প্রবহমানতা এবং মিল দুই-ই থাকে তাকে বলা যায় 'সমিল প্রবহমান পয়ার'। আর যে প্রবহমান বন্ধে পংক্তির নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যও স্বীকৃত হয় না (যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'য়) তাকে বলেছি **মুক্তক**। মুক্তক নামটি রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'য় আছে, হিন্দি ছন্দশাস্ত্রেও আছে। হিন্দি ছন্দশাস্ত্রের মুক্তক আর কাব্যমীমাংসার মুক্তক ঠিক একই অর্থে প্রযুক্ত নয়। আমিও একটু পৃথক্ অর্থেই ব্যবহার করেছি। তবে সর্বত্রই বন্ধনমুক্তির ভাবটা বজায় আছে। এ ক্ষেত্রে পংক্তিসীমার বন্ধন।

অতিপর্ব (Anacrusis)— ছন্দোবন্ধের অতিপংক্তিক পর্বকে আমি নাম দিয়েছিলাম 'অতিপর্ব' এবং এই নামটাই বরাবর ব্যবহার করছি। পরে লক্ষ করলাম আমার পূর্বেই শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। আমার মনে হয় এই শব্দটি যথেষ্ট অর্থজ্ঞাপক, সুতরাং গ্রহণীয়।

বাংলা ছন্দের প্রধান প্রধান সব পারিভাষিক (বিশেষতঃ বিতর্কণীয়) শব্দেরই পরিচয় দেওয়া হল। সুতরাং এ প্রসঙ্গের আয়তন আর না বাড়িয়ে নীচে আমার স্বীকৃত পারিভাষিক শব্দগুলির একটা তালিকা দিলাম। আশা করি তাতে অনেকটা সুবিধা হবে। এগুলি স্বীকার্য কিনা সুধী ব্যক্তিরাই বিচার করবেন। সঙ্গে যে ইংরেজি প্রতিশব্দ দিলাম সেগুলি সবই সংগত কিনা বলবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে অনেকের পক্ষে ভাববার সুবিধা হবে বলে ইংরেজি শব্দগুলি দিলাম। আমি এগুলিই সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি এবং ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক বলেই মনে করি।

৩

ছন্দপরিভাষার শ্রেণীবদ্ধ তালিকা

ছন্দ—metre

ছন্দোনিরূপণ, ছন্দোবিশ্লেষ—scansion

ছন্দোবন্ধ, বন্ধ—metrical form

　　পর্ববন্ধ—foot form

　　পদবন্ধ—clause form

　　পংক্তিবন্ধ—verse form

শ্লোকবন্ধ—verse group

　　যুগ্মক—couplet

　　ত্রিক—triplet

　　চতুষ্ক—quartet

কুলক—stanza

　　পঞ্চক—quintet

　　ষট্‌ক—sestet

　　সপ্তক—septet

　　অষ্টক—octave

ছন্দস্পন্দ, স্পন্দ, তাল—rhythm

　　পংক্তিস্পন্দ—verse rhythm

　　পর্বস্পন্দ—foot rhythm

　　দলস্পন্দ—syllabic rhythm

　　স্পন্দমান গদ্য—rhythmic prose

　　ঊর্ধ্বগ তরঙ্গ—rising rhythm

　　নিম্নগ তরঙ্গ—falling rhythm

ছড়া—folk verse, doggerel

ছড়ার ছন্দ—folk metre, doggerel metre

রীতি, পদ্ধতি—style, mode

　　দলবৃত্ত (-মাত্রিক) রীতি—syllabic style

কলাবৃত্ত (-মাত্রিক) রীতি—moric style
মিশ্রকলাবৃত্ত (-মাত্রিক) রীতি—mixed moric style
লৌকিক রীতি—folk style
ধ্বনি—sound
ধ্বনিবিভাজন—sound analysis, ম্ উ ক্ ত্ ই
স্বর—vowel
মুক্তস্বর—open vowel
রুদ্ধস্বর—closed vowel
মাত্রা—unit of measure
কলামাত্রা—moric unit
দলমাত্রা—syllabic unit
দল—syllable
মুক্তদল—open syllable
রুদ্ধদল—closed syllable
দ্বিদল—dissyllabic
ত্রিদল—trisyllabic
চতুর্দল—tetrasyllabic
দলবিভাজন—syllabication, মুক্. তি
দলমাত্রিক, দলসংখ্যাত, দলবৃত্ত—syllabic
প্রসারণ—lengthening
সংকোচন—shortening
কলা—mora
দ্বিকল—bimoric
ত্রিকল—trimoric
চতুষ্কল—tetramoric
পঞ্চকল—pentamoric
ষট্কল—hexamoric
সপ্তকল—heptamoric
কলামাত্রিক, কলাসংখ্যাত, কলাবৃত্ত—moric

সরল কলামাত্রিক—simple moric
মিশ্র কলামাত্রিক—mixed moric, composite
বল—stress
প্রস্বর—accent
অধিপ্রস্বর—primary accent
উপপ্রস্বর—secondary accent
বলপ্রস্বর—stress accent
গীতিপ্রস্বর—musical or pitch accent
ব্যাপ্তিপ্রস্বর—duration accent
প্রস্বরণ—accentuation
প্রস্বরিত—accented
প্রাস্বরিক—accentual
যতি, ছেদ—pause
ভাবযতি, ভাবচ্ছেদ—sense pause
পূর্ণযতি, পংক্তিযতি—full pause, verse pause
অর্ধযতি, পদযতি—medial pause, caesura
লঘুযতি, পর্বযতি—primary pause, foot pause
উপযতি, উপপর্বযতি—secondary pause
অণুযতি, দলযতি—syllabic pause
ছত্র—line
পংক্তি—verse, metrical line
অমিত্রাক্ষর পংক্তি—blank verse
যতিপ্রান্তিক পংক্তি—end-stopped verse
প্রবহমান পংক্তি—enjambed verse, run-on line
সমিল প্রবহমান পংক্তি—riming enjambed verse
অমিল প্রবহমান পংক্তি—unriming enjambed verse
পদ—verse clause, cæsural division
দ্বিপদী পংক্তি—two-clause verse

পর্ব, গণ—foot

পূর্ণপর্ব—complete foot

অপূর্ণপর্ব—incomplete foot

উপপর্ব—sub-foot, foot section

অতিপর্ব—anacrusis

প্রবহমান—enjambed, run-on

প্রবহমানতা—*enjambement*

মিল, অন্ত্যানুপ্রাস—rime

সমিল—riming

অমিল—unriming

স্বরানুপ্রাস—assonance

সংকেতচিহ্ন

উপরে	(″)	অধিপ্রস্বর	প্রা″স্ব : রি′ক
”	(′)	উপপ্রস্বর	
”	⌣	এককল বা লঘু	ছ̄ন্. দ̆
”	—	দ্বিকল বা গুরু	
পাশে	I	পূর্ণযতি, পংক্তিযতি	
”	‖	অর্ধযতি, পদযতি	
”	|	লঘুযতি, পর্বযতি	
”	⁝	লুপ্ত পর্বযতি	
”	:	উপযতি—ছান্দ : সিক	
মধ্যে	·	অণুযতি, দলযতি—ছন. দ	
”	-	প্রসারণ—ছ-ন্. দ	
নীচে	ˎ	আশ্রয়—মউ˛ : চাক (উ˛ ক্)	

পরিশেষ

গ্রন্থকারের ছন্দবিষয়ক রচনার তালিকা

কালানুক্রমিক

ক। ছন্দপ্রবন্ধ

প্রথম পর্ব (১৩২৯-৩০)

১	বাংলা ছন্দ	প্রবাসী	১৩২৯ পৌষ
২	স্বরবৃত্ত ছন্দ	প্রবাসী	১৩২৯ মাঘ
৩	স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব	প্রবাসী	১৩২৯ ফাল্গুন
৪	ছন্দের শ্রেণীবিভাগ	প্রবাসী	১৩২৯ চৈত্র
৫	মাত্রাবৃত্ত ছন্দ[১]	প্রবাসী	১৩৩০ বৈশাখ
৬	বাংলা ছন্দ ও সংগীত : এক	প্রবাসী	১৩৩০ মাঘ
৭	বাংলা ছন্দ ও সংগীত : দুই	প্রবাসী	১৩৩০ ফাল্গুন
৮	বাংলা ছন্দ ও সংগীত : তিন[২]	প্রবাসী	১৩৩০ চৈত্র

দ্বিতীয় পর্ব (১৩৩৭-৪৪)

৯	মেঘদূত-অনুবাদের ছন্দ	'মেঘদূত' গ্রন্থ[৩]	১৩৩৭ মাঘ
১০	বাংলা ছন্দের বিবর্তন	সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা	১৩৩৮ ভাদ্র
১১	বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ	বিচিত্রা	১৩৩৮ অগ্রহায়ণ
১২	বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান	জয়ন্তী-উৎসর্গ	১৩৩৮ পৌষ
১৩	বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ	বিচিত্রা	১৩৩৮ পৌষ
১৪	ছন্দপ্রসঙ্গ	পঞ্চপুষ্প	১৩৩৮ মাঘ
১৫	ছন্দজিজ্ঞাসা : প্রথমপর্ব	বিচিত্রা	১৩৩৮ মাঘ

১ এই পাঁচটি প্রবন্ধ আসলে 'বাংলা ছন্দ' নামে একটি অখণ্ড রচনার পাঁচটি বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন নামে প্রকাশিত।

২ এই তিনটি প্রবন্ধ আসলে এক রচনারই তিন অংশ।

৩ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-কর্তৃক পদ্যে অনূদিত এবং বর্তমান লেখককর্তৃক সম্পাদিত। উল্লিখিত রচনাটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

১৬	ছন্দজিজ্ঞাসা : দ্বিতীয় পর্ব	বিচিত্রা	১৩৩৮ ফাল্গুন
১৭	ছন্দোবিশ্লেষ : প্রথম পর্যায়	প্রবাসী	১৩৩৮ ফাল্গুন
১৮	ছন্দোবিশ্লেষ : দ্বিতীয় পর্যায়	প্রবাসী	১৩৩৮ চৈত্র
১৯	বাংলা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা	বিচিত্রা	১৩৩৮ চৈত্র
২০	ছন্দজিজ্ঞাসা : তৃতীয় পর্ব	বিচিত্রা	১৩৩৯ বৈশাখ
২১	বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ
২২	ছন্দবিচার[৪]	বিচিত্রা	১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ
২৩	ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ	বিচিত্রা	১৩৩৯ শ্রাবণ
২৪	বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ	বিচিত্রা	১৩৩৯ ভাদ্র
২৫	ছন্দসংকট	উত্তরা	১৩৩৯ ভাদ্র
২৬	স্বরবৃত্ত ছন্দের আইনকানুন	পূর্বাশা	১৩৩৯ আশ্বিন
২৭	কাব্য ও ছন্দ	'অনামী' গ্রন্থ[৫]	১৩৪০ আষাঢ়
২৮	দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ	উদয়ন	১৩৪০ আশ্বিন
২৯	ছন্দের গঠন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন	বিচিত্রা	১৩৪১ শ্রাবণ
৩০	বাংলা কবিতার ছন্দ : এক	য়ন	১৩৪১ ভাদ্র
৩১	বাংলা কবিতার ছন্দ : দুই	উদয়ন	১৩৪১ আশ্বিন
৩২	ছন্দের গঠন	বিচিত্রা	১৩৪১ অগ্রহায়ণ
৩৩	বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ	ভারতবর্ষ	১৩৪১ অগ্রহায়ণ
৩৪	ছন্দমীমাংসা	বিচিত্রা	১৩৪১ ফাল্গুন
৩৫	আক্ষরিক ছন্দ	নবারুণ	১৩৪১ ফাল্গুন
৩৬	যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি : এক	বিচিত্রা	১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ
৩৭	যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি : দুই	বিচিত্রা	১৩৪২ আষাঢ়
৩৮	ছন্দব্যাকরণ	বিচিত্রা	১৩৪৪ আষাঢ়

৪ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের মৌখিক আলোচনা। লেখককর্তৃক অনুলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত।

৫ এই রচনাটি দিলীপকুমার রায়ের 'অনামী' গ্রন্থের 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে পত্রাকারে প্রকাশিত। পত্রটি বস্তুতঃ বিভিন্ন সময়ে লিখিত নানা পত্রের বিচ্ছিন্ন অংশের সংকলন। এটির প্রধান অংশটুকুমাত্র 'কাব্য ও ছন্দ' নামে পরিচিত হবার যোগ্য। শেষ পত্রের তারিখ ১৩৩৮ চৈত্র।

তৃতীয় পর্ব (১৩৪৮-৬৪)

৩৯	Rabindranath and Bengali Prosody[৬]	V. B. Q.	1941 May
৪০	রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ	রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা	১৩৪৮ আশ্বিন
৪১	বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা	পরিচয়	১৩৪৮ ফাল্গুন
৪২	বঁগলা ছন্দ কী সক্ত	বিশ্বভারতী পত্রিকা[৭]	১৩৪৯ আশ্বিন
৪৩	ছন্দের ইশারা	মৃত্তিকা	১৩৫০ আষাঢ়
৪৪	বাংলা ছন্দ ও মিল	কবিতা	১৩৫০ কার্তিক
৪৫	বাংলা ছন্দের গোড়ার কথা	নিরুক্ত	১৩৫০ পৌষ
৪৬	বাংলা ছন্দে ধ্বনিপ্রয়োগ	বৈশাখী	১৩৫১ বৈশাখ
৪৭	রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৫১ শ্রাবণ
৪৮	আধুনিক বাংলা ছন্দ	দেশ	১৩৫১ অগ্রহায়ণ ২
৪৯	বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ও হাস্যরস	বর্ষশেষ	১৩৫১ মাঘ
৫০	বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র	শারদীয় আনন্দবাজার	১৩৫২ আশ্বিন
৫১	ছন্দ	বাংলা ব্যাকরণ[৮]	১৩৫২ অগ্রহায়ণ
৫২	বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ	বাংলা ব্যাকরণ	১৩৫২ অগ্রহায়ণ
৫৩	বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ[৯]	উত্তরা	১৩৫২ ফাল্গুন
৫৪	মিল	বসুমতী	১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ
৫৫	বাংলা কবিতায় ছন্দস্পন্দ ও মিল	পূর্বাশা	১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ
৫৬	'কড়ি ও কোমল'-এর ছন্দ	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৫৫ কার্তিক

৬ রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে লিখিত ও Visva-Bharati Quarterly পত্রিকায় প্রকাশিত।

৭ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী-সম্পাদিত হিন্দী ত্রৈমাসিক পত্রিকা (বিক্রম সংবৎ ১৯৯৯ আশ্বিন)।

৮ জগদীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'। এই রচনাটির ইতিহাস 'নিবেদন' অংশে দ্রষ্টব্য। পরবর্তী ৫২-সংখ্যক রচনাটি এটির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণীয়।

৯ 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের দিলীপকুমার রায়-কৃত সমালোচনার উত্তরে পত্রাকারে লিখিত। এই পত্রপ্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয় 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' নামেই।

৫৭	ছন্দপরিভাষা[১০]	পূর্বাশা	১৩৫৫ মাঘ
৫৮	রাবীন্দ্রিক ছন্দ	উত্তরা	১৩৬০ বৈশাখ
৫৯	ছন্দের খেলা	শারদীয় দেশ	১৩৬১ আশ্বিন
৬০	বাংলা ছন্দ	বেতার জগৎ	১৩৬২ শ্রাবণ
৬১	রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প	গল্পভারতী	১৩৬৪ বৈশাখ

চতুর্থ পর্ব (১৩৬৮-৭১)

৬২	ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : এক	বসুধারা[১১]	১৩৬৮ বৈশাখ
৬৩	রবীন্দ্রসংগীত ও ছন্দ[১২]	গীতবিতান পত্রিকা	১৩৬৮ বৈশাখ
৬৪	ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : দুই	'রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থ[১৩]	১৩৬৮ শ্রাবণ
৬৫	'ছন্দবাঁধা'-পরিচয়	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৬৯ কার্তিক
৬৬	ছন্দকৌতুক	পূর্বাশা	১৩৭০ চৈত্র
৬৭	পয়ার-পরিচয়[১৪]	পূর্বাশা	১৩৭১ আষাঢ়

খ। ছন্দগ্রন্থ

স্বরচিত

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান[১৫]। ১৩৩৮ পৌষ

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১৩৫২ আষাঢ়

ছন্দপরিক্রমা। ১৩৭২ বৈশাখ

ছন্দজিজ্ঞাসা। যন্ত্রস্থ

সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ'। ১৩৬৯ কার্তিক

---

১০ পুনঃসংস্কৃতরূপে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত 'পরিভাষা-পরিচয়' নামে।

১১ পরে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'রবিপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থে (১৩৬৮ আষাঢ়) সংকলিত।

১২ 'বাণী ও বীণা' নামে প্রকাশিত।

১৩ হরপ্রসাদ মিত্র-সম্পাদিত।

১৪ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়রূপে সংকলিত।

১৫ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থে প্রকাশিত ও কিছু পরিমার্জিত-রূপে পুস্তিকা-আকারে পুনঃপ্রকাশিত। পুস্তিকার তারিখ ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ। বর্তমান গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ের 'সূচনা' অংশে এটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

মূল্য চার টাকা